Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নবী ও সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Sadia Sultana Anni

রোলঃ 215001164

০৫ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নবী ও সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Sadia Sultana Anni

রোলঃ 215001164

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলাম প্রচারে নবী ও সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Sadia Sultana Anni, আইডিঃ 215001164 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলাম প্রচারে নবী ও সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sadia Sultana Anni

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

০৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Sadia Sultana Anni

আইডিঃ 215001164

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.ভূমিকা	৫
২.দাওয়াহ কি?	৬
৩.দাওয়াহ কেন দিবো?	৭
৪.নবীদের দাওয়াতি মিশন	৯
৫.সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন	১২
৬.দাওয়াহ নিয়ে ফিকির	১৫
৭.দাওয়াহ না দেওয়ার পরিণতি	১৮
৮.দাওয়াহ দিব দাঈ হব	২১
৯.দাওয়াহ এর গুরুত্ব	২৬
১০.রাসূল সা: এর দাওয়াতি মিশন	৩৬
১১.শেষকথা	৫৯

১. ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসে ইসলাম প্রচারে নবী ও সাহাবীদের দাওয়াতের মিশন ছিলো সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই মহান ব্যক্তিদের মাধ্যমেই ইসলামের দাওয়াতি কাজ শুরু করিয়েছেন যা এখন অব্দি চলমান রয়েছে। ইসলাম প্রচার করাই ছিলো নবী ও সাহাবিদের জীবনের মিশন ও ভিশন। পুরো জিন্দেগীই তাঁরা ইসলাম প্রচারের কাজে কাটিয়েছেন এবং এই কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে করতে হয়েছে অসংখ্য আত্মত্যাগ। ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই আমরা আজ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির শুরু থেকে দাওয়াতের এই কাজ শুরু হয়েছে, বর্তমানে চলছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলবে ইনশাআল্লাহ। প্রকৃত দাওয়াত দানকারী তিনিই-যিনি মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার আগে নিজেকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেন, অর্থাৎ “First you sell yourself”. বর্তমান যুগে আল্লাহ তাআ'লা দাওয়াতি কাজকে আমাদের জন্য অনেক সহজ করে দিয়েছেন। আমাদের পূর্বেকার লোকদের জন্য এতটা সহজ ছিলো না। আজকের যুগে ইসলাম প্রচার, দাওয়াতি কাজ পরিচালনা ও মানুষের কাছে দলীল প্রমাণ উপস্থাপন অনেক দিক দিয়েই সহজ। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে দাওয়াত ও প্রচারকর্ম আরও সহজ হয়ে গিয়েছে। অতএব, জ্ঞানবান ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ ও নায়েবে রাসূলদের ওপর অবশ্য কর্তব্য, সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে একাজে আত্মনিয়োগ করা, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আল্লাহর বার্তা তার বান্দাদের নিকট পৌঁছে দেয়া। এ মহৎ কাজে জড়িত হলে চারদিক থেকে অসহযোগীতা, বাঁধা ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপের সম্মুখীন হতে হবে। এসব আমলে না নিয়ে নির্ভয়ে সম্মূখপানে এগিয়ে যেতে হবে। পৃথিবীর শুরু থেকেই মানুষ এক অভিন্ন দ্বীনের অনুসারী ছিল। মানুষকে আল্লাহ তাআলা সীরাতুল মুসতাকীমের প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রথম থেকেই নবী-রাসূল প্রেরণের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁদেরকে প্রেরণ করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে সকল দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা। আল্লাহপ্রদত্ত ঐশী শিক্ষার দাওয়াত দেয়া। মূলত ঈমান হচ্ছে শিকড়। আর বাকি সব তার ডালপালা। নবী-

রাসূলগণ মানুষের অন্তরে সর্বপ্রথম ঈমান নামের এ আসমানী বৃক্ষ রোপনের মেহনত করেছেন। এরপর পর্যায়ক্রমে সেই গাছে অন্যান্য শাখা-প্রশাখা যুগিয়েছেন। তবেই তা কাঙ্ক্ষিত ফল দান করেছে। ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া একটি উত্তম আমল। কেননা, এই দাওয়াত দানের মাধ্যমে মানুষ সরল পথের দিশা পায়। এর মাধ্যমে মানুষকে তার দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তির পথ দেখানো হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ওই ব্যক্তির চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে। আর বলে অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা হামিম আস-সাজদাহ, আয়াত-৩৩) সাধারণভাবে সব মুসলমান এবং বিশেষভাবে আলেমসমাজকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর তারাই সফলকাম। (সুরা আলে-ইমরান, আয়াত-১০৪)

২. দাওয়াহ কি?

দা'ওয়াহ বা দাওয়াহ (আরবি: دعوة, প্রতিবর্ণীকৃত: "আমন্ত্রণ") মানে ইসলামের প্রচার। দা'ওয়াহ আক্ষরিক অর্থে "আমন্ত্রণ" করাকে বোঝায়, ক্রিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণ যার অর্থ বিভিন্নভাবে "ডাকা" বা "আমন্ত্রণ জানানো"। ইসলামী দাওয়াহ মানে ইসলামের দাওয়াত পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া।

The Hanswehr Dictionary of Modern Written Arabic- এ দাওয়াহ শব্দটির অর্থে বলা হয়েছে : Missionary activity, Missionary work, Propaganda. অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে আহবান করা, অনুপ্রাণিত করা বা ডাকাকে বলা হয় দাওয়াত।

দাওয়াত দুই ধরণের হতে পারেঃ

ক. নেতিবাচকঃ রাসূল (সা:) বলেন, যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে মানুষদেরকে ডাকে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের একটি অংশ। প্রশ্ন করা হলো সে যদি নামাজ পড়ে এবং রোজা রাখে? জবাবে রাসূল (সা:) বলেন, যদি সে নামাজ পড়ে রোজা রাখে এবং বলে আমি একজন মুসলমান তবুও তার জন্য জাহান্নামের অংশ রয়েছে। – মুসলিম

খ. ইতিবাচকঃ দাওয়াতের দুটি দিক রয়েছে। প্রকাশ্য দাওয়াত বা মৌখিক দাওয়াত, অপ্রকাশ্য দাওয়াত বা চারিত্রিক দাওয়াত। মানব সৃষ্টির পর তার সামনের দুটো দিক খুলে দেয়া হয়েছে- ইন্না হাদাইনাহুস সাবিলা ইম্মা শাকিরাও ওয়া ইম্মা কাফুরা। অর্থ- আমরা পথ দেখিয়ে দিলাম মানুষকে এজন্য যে তাদের কারা কৃতজ্ঞ ও কারা অস্বীকারকারী । আমি মানুষকে দেখিয়েছি-

১) কৃতজ্ঞতা বা আনুগত্যের পথ ২) কুফরীর পথ

আমরা আশরাফুল মাখলুকাত। অর্থাৎ সব সৃষ্টির সেরা জীব। আবার মুসলমান হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উম্মত বা শ্রেষ্ঠ জাতি। কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

كنتم خير أمة أخرجت للناس

অর্থাৎ তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মুসলমান অর্থ আত্মসমর্পণকারী।

৩. দাওয়াহ কেনো দিবো?

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। সেই মহান ব্যক্তিরা তাদের জান মাল দিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজে সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। আমরা উম্মতে মুহাম্মাদী। ইসলাম প্রচারের এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বর্তমানে দাওয়াতের এই গুরু দায়িত্ব আমাদের উপরেও রয়েছে। দাওয়াহ দেওয়ার ফলে একদিকে যেমন আমরা উম্মাহের খেদমতে জড়িত থাকবো অপরদিকে

নিজেদের ঈমান আমলে মজবুতির ব্যাপারেও তৎপর হতে পারবো। যেসব কারণে আমাদের দাওয়াত দেওয়া উচিৎ-

- রাসূলের দায়িত্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য
- নিজেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ রাখার জন্য
- সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে দাওয়াত দিতে হবে
- আল্লাহ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য
- আখেরাতের নাজাতের জন্য
- আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ
- আল্লাহ রাসূল (সঃ) এর সর্বশেষ নির্দেশ ছিল দাওয়াত দান
- দাওয়াত দান করা ফরজে আইন
- সাহাবায়ে আজমাঈন আনুগত্য করে দেখিয়ে গেছেন

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ হলোঃ

(ক) দাওয়াত দেয়া মৌলিক দায়িত্ব:

يَاأَيُّهَاالرَّسُولُبَلِّغْمَاأُنْزِلَإِلَيْكَمِنْرَبِّكَوَإِنْلَمْتَفْعَلْفَمَابَلَّغْتَرِسَالَتَهُوَاللَّهُيَعْصِمُكَمِنَالنَّاسِإِنَّاللَّهَلَايَهْدِيالْقَوْمَالْكَافِرِينَ

হে রাসূল (সা:)! আপনার উপর আপনার প্রতিপালক যা অবতীর্ণ করেছেন তা পৌঁছে দিন । যদি এ কাজ না করেন তবে রিসালতের দায়িত্বই পালন করা হয়নি। (সূরা মায়েদা :৬৭)

(১)يَاأَيُّهَاالْمُدَّثِّرُ (২)قُمْفَأَنْذِرْ (৩)وَرَبَّكَفَكَبِّرْ

হে চাদর আবৃত ব্যাক্তি! উঠুন ও ভয় প্রদর্শন করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। (আল-মুদ্দাসসির:১-৩)

هُوَ الَّذِيأَرْسَلَرَسُولَهُبِالْهُدَىوَدِينِالْحَقِّلِيُظْهِرَهُعَلَىالدِّينِكُلِّهِوَلَوْكَرِهَالْمُشْرِكُونَ

নিশ্চয়ই আমি হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে রাসূলকে (সা:) পাঠিয়েছি অন্য সকল দ্বীনের উপর ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য। (সূরা সফ:৯)

(খ) প্রকাশ্য ও গোপনে দাওয়াত:

ثُمَّإِنِّيدَعَوْتُهُمْجِهَارًا (৮) ثُمَّإِنِّيأَعْلَنْتُلَهُمْوَأَسْرَرْتُلَهُمْإِسْرَارًا (৯)

অর্থাৎ আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি। অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং তাদেরকে গোপনে চুপিসারে ও দাওয়াত দিয়েছি। (সূরা নুহ:৮-৯)

(গ) দাওয়াত হবে সর্বাবস্থায়:

قَالَرَبِّإِنِّيدَعَوْتُقَوْمِيلَيْلًاوَنَهَارًا

অর্থাৎ তিনি বলেন, হে প্রভু আমি আমার জাতিকে রাতে দিনে সর্বাবস্থায় দ্বীনের দিকে আহবান করছি। (সূরা নুহ -৫)

দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু হবে- (১) তাওহীদ (২) রিসালাত (৩) আখেরাত

৪. নবীদের দাওয়াতি মিশন:

নবী রাসূলগণের মৌলিক দায়িত্ব ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, চিরন্তন সত্যের পথে আহ্বান করা, মানুষ যেসব সত্য নিজ থেকে আবিষ্কার করতে অক্ষম সেসব বিষয়ে তাকে অবহিত করা। আর যারা তাদের দাওয়াত গ্রহণ করবে তাদেরকে পরকালীন শাশ্বত সুখের সুসংবাদ দেয়া এবং যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তাদেরকে জাহান্নামী জীবনের দুঃসংবাদ পৌঁছে দেয়া, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে হুঁশিয়ার করা। বিভিন্ন নবীদের দাওয়াত-

(ক) হযরত নূহ (আঃ) এর দাওয়াতঃ

لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٍ

অর্থাৎ আমরা নূহকে তার জাতির লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছি; তিনি বলেন, হে জাতির লোকেরা তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। কেননা তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নাই। আমি তোমাদের জন্য একটি বড় আজাবের ভয় পোষণ করি। (সূরা আ'রাফ- ৫৯)

(খ) হযরত হুদ (আঃ) এর দাওয়াতঃ

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمۡ هُودٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ

অর্থাৎ এবং 'আদ' জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই 'হুদ' কে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নাই। এর পরেও কি তোমরা ভয় করে চলবে না। (সূরা আ'রাফ- ৬৫)

(গ) হযরত সালেহ (আঃ) এর দাওয়াতঃ

قَالَ يَاقَوْمِ اعْبَدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلَهٍ غَيْرُهُ -وَ اِلَى عَادٍ اَخَاهُمْ صَالِحًا

অর্থাৎ এবং 'সামুদ' জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই 'সালেহ' কে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নাই। (সূরা আ'রাফ- ৭৩)

(ঘ) হযরত লুত (আঃ) এর দাওয়াতঃ

إِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٥وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ أَتَأۡتُونَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنۡ أَحَدٖ مِّنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٥ٱلرِّجَالَ شَهۡوَةٗ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ مُّسۡرِفُونَ

অর্থাৎ এবং লুত যখন নিজ জাতির লোকদের বললেন, তোমরা এমন সব নির্লজ্জ কাজ করছো যে, তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেউ এ কাজ করেনি। তোমরা নারীদেরকে বাদ

দিয়ে পুরুষদের সাথে কাম বাসনা চরিতার্থ করছো; বরং তোমরা সীমালংঘনকারী একটি জাতি। (সূরা আ'রাফ- ৮০)

(ঙ) হযরত শোয়াইব (আঃ) এর দাওয়াতঃ

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অর্থাৎ আর মাদিয়ানবাসিদের প্রতি আমরা তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন; হে জাতির লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল এসে গেছে। অতএব ওজন ও পরিমাপ পূর্ণমাত্রায় কর, লোকদের তাদের দ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্থ করে দিওনা এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, যখন তা সংশোধন ও সংস্কার হয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। (সূরা আ'রাফ- ৮৫)

(চ) হযরত ইউসুফ (আঃ) এর দাওয়াতঃ

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ- مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ হে কারা বন্ধুগণ! বিভিন্ন রব কি উত্তম না মহাপ্রাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে অবাস্তব নামের পুজা করছো-যাদেরকে তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা সাব্যস্ত করে নিয়েছে, আল্লাহ তো সেগুলি সমন্ধে কোন প্রমাণ পাঠান নাই। নিশ্চয়ই হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর, তোমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, একনিষ্টভাবে কেবলমাত্র তারই ইবাদত করবে। এটিই হচ্ছে তোমাদের জন্য স্থায়ী বিধান। (সূরা ইউসুফ- ৩৯, ৪০)

(ছ) হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর দাওয়াতঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

অর্থাৎ স্মরণ কর ইব্রাহিমের ঘটনা, যখন তিনি তার পিতা আজরকে বলেছিলেন, তুমিতো মূর্তি গুলোকেই ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছ। আমিতো তোমাকে এবং তোমার জাতিকে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। (সূরা আন'আম- ৭৪)

(জ) হযরত মুসা (আঃ) এর দাওয়াতঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

অর্থাৎ স্মরণ কর যখন আমরা বনি ইসরাইলদের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না। মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকীনের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। মানুষের সাথে সুন্দর সুন্দর কথাবার্তা বলবে, নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া তোমরা সকলেই এই প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছ এবং শেষ পর্যন্ত ঐ অবস্থায় রয়ে গেছ। (সূরা বাকারাহ- ৮৩)

(ঝ) হযরত ঈসা (আঃ) এর দাওয়াতঃ

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

অর্থাৎ এবং মসীহ তো বলেছিল; হে বনী ইসরাইলের লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কর, যিনি আমারও রব তোমাদেরও রব। বস্তুতঃ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে যে শরীক করেছে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। আর তাদের পরিণতি হবে জাহান্নাম। এই যালেমদের কোন সাহায্যকারী নাই। (সূরা মায়েদা- ৭২)

৫. সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন:

নবী করিম সা:-এর পরে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হলেন সাহাবায়ে কেরামের প্রজন্ম। কুরআন ও সুন্নাহর পর তাদের কথা ও কর্ম উম্মতের জন্য দলিল। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র মানুষের জন্য তারা সত্যের মাপকাঠি, হেদায়েতের আলোকবর্তিকা।

নবুয়াতের দাওয়াত গ্রহণ ও প্রচারের জন্য নবী করিম (সা:)-এর সাথী হিসেবে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের জামাতকেই নির্বাচন করেছেন। তাদের প্রতি নিজের রাজি-খুশির কথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য সব রকমের গুণাবলি তাদের ভেতর বিদ্যমান ছিল পূর্ণমাত্রায়। সর্বপ্রকার ভালো গুণের বাস্তবায়নের কারণেই কাফেররা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ঘোষিত হয়েছে, (হে মুসলিমগণ) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা পুণ্যের আদেশ করে থাকো ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাকো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো। (সূরা আলে ইমরান-১১০)

এই আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামসহ সমগ্র মুসলিম উম্মতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে সাহাবীরা জীবনভর এই আদেশের ওপর আমল করেছেন পূর্ণাঙ্গরূপে। যখন জবানের প্রয়োজন হয়েছে, জবান দিয়ে আর যখন জীবন ও সম্পদের প্রয়োজন হয়েছে, তখন জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদের মাধ্যমে। শুধু এতটুকু নয়, তারা পরবর্তী প্রজন্ম তাবেয়িদেরও এসব গুণাবলি শিক্ষা দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতের কথা আগে এবং ঈমানের কথা পরে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, দাওয়াত এই উম্মতের দায়িত্ব এবং এর দ্বারাই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে।

সাহাবাদের দাওয়াত ছিল একক পদ্ধতির। সেটা হলো, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে দাওয়াত প্রদান করা। সাহাবারা নিজেদের জান-মাল ও সময় ব্যয় করে দাওয়াতের কাজ করেছেন। যে কাজে জান-মাল খরচ হয় সে কাজের সঙ্গে ভালোবাসা তৈরি হয়। দাওয়াতের সঙ্গে ছিল সাহাবাদের অসম্ভব ভালোবাসা। তারা ছিলেন দ্বীনের সাহায্যকারী। ফলে আল্লাহতা'আলাও তাদের জন্য সাহায্যের দরজা উম্মুক্ত রেখেছেন। দ্বীনদার হওয়া আর দ্বীনের সাহায্যকারী হওয়া এক নয়। দ্বীনের সাহায্যের ওপর আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদা রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন।' আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ তার দ্বীনের সাহায্য করা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কষ্ট স্বীকার করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আর দ্বীনের জন্য কষ্ট

স্বীকার ও সহযোগিতার ফলে ইস্তিকামাত তথা দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার গুণ সৃষ্টি হয়। যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বিষয়। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন ইস্তিকামাতের মূর্তপ্রতীক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা (রাঃ) বন্দি হয়ে রোম সম্রাটের নিকট উপনীত হলে সম্রাট তাকে প্রস্তাব দিলো, তুমি ইসলাম ত্যাগ করলে আমার অর্ধরাজত্ব তোমায় লিখে দেব। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা (রাঃ) সম্রাটের এ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। সম্রাট তাকে লোমহর্ষক নির্যাতনের ভয় দেখালেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা দ্বীনের ওপর অটল, অবিচল। চোখের সামনে কড়াইয়ে তৈল গরম করা হলো। ফুটন্ত তেলে খানিকবাদেই কৈ ভাজা হতে যাওয়া আবদুল্লাহর চোখে মুখে হতাশার লেশমাত্র নেই। সম্রাট ডাকলেন। পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে গেলেন আবদুল্লাহ। সম্রাটের বক্তব্য, দ্বীন ত্যাগ করলে মুক্তি, না হয় এখনই নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন। আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা অশ্রুসজল নয়নে আশা প্রকাশ করেন, 'হায়! আমার যদি একশত প্রাণ থাকতো তাহলে প্রতিটি প্রাণ আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিতাম।' ভরকে গেলো সম্রাট। কী বলে এ মুসলমান! এরা কোনো ভীনজগতের প্রাণি নয় তো? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফাসহ ধৃত সব সাহাবাকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়ে সম্রাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এভাবেই আল্লাহর সাহায্য ধরা দিয়েছে সাহাবাদের জীবনে।

আল্লাহর গায়েবি সহায়তা ইনফেরাদি দাওয়াতের ওপর নির্ভর। আমরা গায়েবি সাহায্য বলতে বুঝি, বাহ্যিক উপায়-উপকরণ ব্যতিরেখে প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাওয়া। বিষয়টি আসলে তা নয়। বস্তুতঃ গায়েবি সাহায্য হচ্ছে, অমুসলিমদের দ্বীনের দাওয়াত এমনভাবে দেওয়া যাতে সে মুসলমান হতে বাধ্য হয়।

নবীজি (ﷺ) কোনো এক সফরে ছিলেন। সাহাবারাও ছিলেন সঙ্গে। পথে জনৈক গ্রাম্য লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে আল্লাহর দিকে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। সে ব্যক্তি বলল, আপনি যে আল্লাহর রাসূল তার সাক্ষি কি? নবীজি (ﷺ) সাহাবাদের সাক্ষি করেননি। বরং একটি গাছকে ডাকলেন। গাছটি মাটি ফেঁড়ে এসে নবীজির সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে প্রস্তান করল। তা দেখে ওই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে। নবীদের জীবনে এভাবে গায়েবি সাহায্য এসেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)

বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে লোক মারফত পত্র প্রেরণ করেছেন। বুঝা গেল, দাওয়াতের জন্য ব্যক্তির গমন জরুরি। পারস্যের দাম্ভিক সম্রাট কর্তৃক নবীজির পত্র ছিঁড়ে ফেলার সংবাদ মদিনায় পৌঁছলে নবীজি বললেন, সে আমার পত্র নয় বরং তার সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। পরবর্তীতে তাই হয়েছে। পারস্য সম্রাটের দ্রুত পতন হয়েছে এবং তার সাম্রাজ্য ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। এটাও আল্লাহর গায়েবি সাহায্য। সুতরাং গায়েবি সাহায্য পেতে হলে নবীজি (ﷺ) এবং সাহাবাদের তরিকায় দাওয়াতের কাজ করতে হবে। বিদায় হজের ভাষণে প্রিয়নবী (ﷺ) বলেছেন, 'আমার একটি কথা হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও। ' সাহাবারা সেই ময়দান থেকেই দাওয়াতের কাজে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন একটি বৃহত্তর ইসলামী সামাজিক বিন্যাসের একটি অংশ ছিলো, যা ইসলামের প্রসারে একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করে।

৬. দাওয়াহ নিয়ে ফিকির

দাওয়াতের ফিকির হলো, কীভাবে প্রত্যেকটা মানুষ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে। রাসূল (ﷺ)-এর দরদ ছিলো, জ্বালা ছিলো এটাই কীভাবে মানুষ জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যায়। সেই সুন্নত হিসেবে আমরা চেষ্টা করবো যাতে প্রত্যেকটা কাঁচা-পাকা ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। বিশেষ করে অমুসলিমদের মাঝে। দাওয়াতি কাজের জন্য সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে দিলের দরদ ও ব্যথা।

দাওয়াহ দেওয়া আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। বাংলাদেশ সংবিধানের ৪১, ১-এর ক ধারায় আছে 'প্রত্যেক নাগরিক তার নিজ নিজ ধর্ম প্রচার করতে পারবে। সেটা আমাদের রাষ্টীয়, নাগরিক ও মানবীক অধিকার যে, আমরা আমাদের ধর্ম প্রচার করতে পারবো। অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়া আমাদের একার কাজ নয়। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব।

দাওয়াত দিতে গেলে হিন্দু জনগোষ্ঠীর লোকেরা কেউ কেউ দূর থেকে অনেক কিছু ভাবে, কিন্তু যখন তাদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলা হয়, তাদের সত্যটা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়, তখন তারা বুঝে যে আমরা তাদের দুশমন নই। বরং তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণকামী। তাদের চিরস্থায়ী আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। এটা যখন বুঝতে পারে তখন মন্দ কিছু বলে না।

অপরদিকে সাধারণ অমুসলিমকে যখন দাওয়াত দিবো, ইসলামের সত্যের কথা বলবো, পিপাসার্ত মানুষকে পানি দিলে যেরকম খুশি হয় তারাও সেরকম খুশিই হবে ইনশা আল্লহ। তবে, তাকে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতিটি ভুল হলে সে নারাজ হতে পারে। এজন্য দাওয়াতের কাজ ও কৌশল সম্পর্কে অবগত হয়ে কাজ করলে ফায়দা বেশি হয়।

দাওয়াতের জন্য প্রথম দরকার দরদ থাকা । আমি যাকে দাওয়াত দিতে চাচ্ছি তার জন্য ফিকির, দরদ ও দোয়া করা লাগবে। যে লোকটা চিরস্থায়ী জাহান্নামে জ্বলবে তাদের ফিকির নিয়ে শেষরাতে তাহাজ্জুদ পড়ে যাকে দাওয়াত দিব তাকে টার্গেট করে নাম ধরে ধরে দোয়া করা।

আপনি যাকে চান হেদায়েত দিতে পারবেন না। আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়েত দিবেন। এজন্য আল্লাহর কাছ থেকে হেদায়েত চেয়ে নেয়া। এরপর ব্যথা-দরদ ও মুহাব্বতের সাথে দাওয়াত দিতে যাওয়া। ওই ভাইয়ের সাথে কথা বলা। তার কল্যাণ নিয়ে কথা বলা, যেন লোকটা বুঝতে পারে যে, আমি তার কল্যাণের জন্য এসেছি। তাকে বুঝানো। এইজন্য সবচেয়ে লক্ষণীয় জ্বালা, দরদ-ব্যথা। রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নত তাহাজ্জুদে দোয়া, কান্নাকাটি করা এবং এই ইয়াকীন করা এই লোক মারা যাওয়ার পর চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে। কীভাবে তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো যায়! সে বুঝতে পারছে না তার যে কমতি আছে সে ফিকির তার নাই। সেই চিন্তা তার মধ্যে জাগ্রত করা।

রাসূল (ﷺ)-এর একটি হারানো সুন্নত হলো, নবীজি অমুসলিমদের নাম ধরে ধরে দোয়া করতেন। হযরত ওমর (রা.) রাসূলের দোয়ার ফসলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এমন অনেক সাহাবীর নাম ধরে ধরে দোয়া করেছেন নবীজী।

দাওয়াতী কাজ এমন এক কাজ যা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) করতেন। তারা বিভিন্ন ব্যবসা করতেন। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব কাজ ছিলো। তবুও তারা প্রত্যেকে দায়ী ছিলেন। যে যেখানে ছিলেন দাওয়াতের কাজ করেছেন। প্রত্যেকের মিশন ছিলো দাওয়াত দেওয়া। যেমনিভাবে খাবার খাওয়া আমাদের একটি কাজ তেমনি দাওয়াতকে নিজের কাজ বানিয়ে নেয়া চাই। যে যেই অবস্থায় থাকি সেভাবেই দাওয়াতের কাজ করা দরকার।

এর খুব সহজ একটি পদ্ধতি হলো এই যে, যেই মহল্লায় থাকি সেখানকার অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়া। দায়ীদের প্রশিক্ষণ দেয়া। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। বিশেষ করে তরুণ আলেমরা যে যেই গণ্ডিতে আছে সেখান থেকে অনেক কাজ করা যায়। শুধু দরকার ইচ্ছে শক্তি। যদি সদিচ্ছা আর চেষ্টা থাকে অনেক কাজ করা যাবে। আল্লাহর কাছে দুআ ও কান্নাকাটি করে নিজের কাজ করে যাওয়া চাই।

দাওয়াতের এই কাজ নির্দিষ্ট কোনো দলের কাজ নয়। বরং প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে রাসূল, আপনি বলে দিন এটা আমার কাজ। এটা আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকি বুঝে শুনে। এটা আমার কাজ এবং যারা আমার অনুসরণ করে তাদের কাজ। আমরা রাসূলের অনুসরণ করি। সে হিসেবে দাওয়াত রাসূলের কাজ, তাই এটা আমাদেরও কাজ। আমরা আমাদের যে অবস্থানে আছি সেখান থেকেই দাওয়াত দেওয়া সম্ভব। অনেকসময় সহজ বিষয়কেও কলাকৌশল না জানার কারণে কঠিন মনে হয়। আসলে বড় কথা, হিম্মত ও দরদ-ব্যথার সাথে কাজ করলে সব সহজ হয়ে যাবে। নুসরত আসবে, ইনশা আল্লাহ।

আমরা যে যেখানে আছি সেখান থেকে রাসূলের ফিকির ও দরদ ব্যথা নিয়ে ঈমানের পিপাসায় তৃষ্ণার্ত মানুষগুলোর কাছে যাবো। মানুষ ওৎ পেতে আছে ইসলাম কবুল

করার জন্য। সত্য কথা বলা দরকার। আমরা অনেক সময় ভয় পাই। কি জানি হয়! আসলে কিচ্ছু হবে না। আল্লাহর জন্য সুন্দরভাবে মুহাব্বতের সাথে ভালো কৌশলে দাওয়াত দিলে অনভিপ্রেত কিছুই হবে না। আমরা যেখানে আছি প্রত্যেকেই আশপাশে দাওয়াত দিবো। থানা, জেলায়। নিজের কাজ মনে করে যদি দাওয়াতের কাজ করি তাহলে অনেক কাজ করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী, ইনশা আল্লাহ।

৭. দাওয়াহ না দেওয়ার পরিণতি:

ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজ করা সবার জন্য জরুরি। ভালো কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার এই মহান কাজ বন্ধ হয়ে গেলে পৃথিবীতে অন্যায়-অনাচার ছেয়ে যাবে। তাই মহানবী (ﷺ) বলেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে। অন্যথায় শিগগিরই আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর আজাব পাঠাবেন। এরপর তোমরা (মুক্তির জন্য) তাঁর কাছে দোয়া করবে, তবে তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। (তিরমিজি)

তাই সবার উচিত, ইসলাম প্রচারের কাজে বেশি বেশি আত্মনিয়োগ করা এবং আখিরাতের সাফল্য লাভের পথে এগিয়ে চলা। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন। আমীন।

আল্লাহর পথে দাওয়াত দানে অলসতাকারীর জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِيْ حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعُ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ أَعلاَهَا فَكَانَ الَّذِيْ فِيْ أَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِيْ أَعْلَهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوْا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِيْ وَلاَ بُدَّلِيْ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجُوْهُ وَنَجُّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوْهُ أَهْلَكُوْهُ وَأَهْلَكُوْا أَنْفُسَهُمْ.

নূ'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর বিধান পালনে অলসতাকারী ও অমান্যকারীর দৃষ্টান্ত ঐ লোকদের ন্যায় যারা লটারীর মাধ্যমে কেউ

জাহাজের উপরে, কেউ জাহাজের নীচে স্থান পেয়েছে। তাদের মধ্যে যারা নীচে রয়েছে, তারা পানি আনার জন্য উপরে গেলে উপরের লোকদের কষ্ট হত। কাজেই নীচের এক ব্যক্তি (পানি সংগ্রহের জন্য) একটি কুঠার নিয়ে নৌকার তলা ছিদ্র করতে আরম্ভ করল। তখন উপরের লোকজন এসে বলল, তোমার কি হয়েছে? (তুমি নৌকা ছিদ্র করছ কেন?) সে বলল, উপরে পানি আনতে গেলে তোমাদের কষ্ট হয়, আর পানির আমার একান্ত প্রয়োজন। এক্ষণে যদি তারা ঐ ব্যক্তিকে নৌকা ছিদ্র করতে বাধা দেয় তবে তারা তাকে এবং নিজেদেরকে রক্ষা কররে। আর যদি তাকে নৌকা ছিদ্র করার কাজে ছেড়ে দেয় তবে তারা তাকে এবং নিজেদের ধ্বংস করল। (বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৮; বাংলা মিশকাত ৯ম খন্ড, হা/৪৯১১)।

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مِنْكُمْ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُوْشِكُ أَنْ يَّعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابَهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُّغَيِّرُوْا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَّعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ.

আবু বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই মানুষ যখন কোন অপছন্দ কথা বা কর্ম লক্ষ্য করে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে না, অচিরেই আল্লাহ তাদের সকলকে শাস্তি দিবেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে পাপ হ'তেথাকে এবং প্রতিরোধ করতে সক্ষম ব্যক্তিরা প্রতিরোধ না করে, তখন আল্লাহ সকলকেই শাস্তি দেন। (তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫১৪২; বাংলা মিশকাত ৯ম খন্ড, হা/৪৯১৫)।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْحَي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْ أَقْلِبَ مَدِيْنَةَ كَذَا كَذَا بِأَهْلِهَا قَالَ يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فُلاَنًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ أَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ.

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে বললেন, ওমুক ওমুক শহর তার অধিবাসী সহ উল্টে দাও অর্থাৎ ধ্বংস করে দাও। জিবরীল বললেন, প্রতিপালক! তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি এক মুহূর্তও আপনার নাফরমানী করেন না। আল্লাহ বললেন, তাকে সহ সকলকে

ধ্বংস করে দাও। নিশ্চয়ই তার মুখ আমার ব্যাপারে এক মুহূর্তও চিন্তিত হয় না। অর্থাৎ অপরকে দাওয়াত প্রদান করে না। (বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫১৫২)।

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার আত্মা রয়েছে। অবশ্যই তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে আর মন্দ কাজের নিষেধ করবে। নইলে আল্লাহ তার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি পাঠাবেন, তখন তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে কিন্তু তোমাদের প্রার্থনা কবুল হবে না। (তারগীব হা/৩৩০৭)।

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَاب لكم.

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করবে। নইতোবা অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তা‘আলা নিজের পক্ষ হতে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা (আযাব মুক্তির জন্য) তাঁর নিকট দো’আ করবে, কিন্তু তোমাদের দো’আ কবুল হবে না। (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০)।

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّروا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتُوْا.

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয়, আর সে সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে পরিবর্তন করে না, তখন তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তা’আলার আযাব তাদের উপর পতিত হয়। (আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৪৩)।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যারা দাওয়াত প্রদানে অলসতা করে, কিন্তু নিজেরা সর্বদা ইবাদত করে, তারাও পাপীদের সাথে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। কেননা দাওয়াত দান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা ত্যাগ করা গর্হিত অপরাধ। কাজেই দাওয়াতী কাজ না করে শুধুমাত্র ইবাদতে মশগূল থাকলে সে ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮. দাওয়াহ দিব দাঈ হব:

যারা দাওয়াহ দেয় তাদেরকে দাঈ বলা হয়। যারা দাঈ তারা সর্বক্ষণ দাওয়াতের ফিকিরেই থাকে। কখন কিভাবে কাকে কোন পন্থায় দাওয়াহ দেওয়া যায় এই ফিকিরেই তারা সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে।

আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারী দাঈদের কিছু গুণাবলি থাকা আবশ্যক।

- সত্যবাদি হওয়া
- ধৈর্য্যশীল হওয়া
- কোমল স্বভাবের অধিকারী হওয়া
- দ্বীনি কাজে একনিষ্ঠ হওয়া
- কথায় ও কাজে মিল থাকা

"দাঈ হবে বরফের মতো ঠান্ডা,পাহাড়ের মতো অটল,আকাশের মতো উদার,মাটির মতো বিনয়ী সূর্যের মতো দাতা, উটের মতো ধৈর্যশীল, ব্যবসায়ীদের মতো হেকমতওয়ালা ও কৃষকের মতো হিম্মতওয়ালা"

দাঈ হতে হলে আল্লাহ ওয়ালা হতে হবে, তাহাজ্জুদগুজারী হতে হবে, অধিক ইস্তিগফার করতে হবে।

(ক) দায়ীকে হেকমাত অবলম্বন করা

- স্বাভাবিক সময়ে
- অস্বাভাবিক সময়ে

(খ) উত্তম উপদেশ বর্ণনার অধিকারী হওয়া

(গ) দায়ীকে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে দাওয়াত উপস্থাপনের যোগ্য হওয়া। (এ ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদিসের বক্তব্যগুলি উপস্থাপন করতে পারলে ফলাফল বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে)

(ঘ) দায়ীকে চরম ধৈর্যশীল হওয়া। অর্থ: আর ধৈর্য ধারণ দায়ীকে বিরাগ ও ক্ষমার মানসিকতার অধিকারী হওয়া। (অর্থ: আর তারা রাগকে সংবরণকারি এবং মানুষদের প্রতি ক্ষমাশীল। আল কোরআন)

(ঙ) দায়ীকে কথা ও কাজের মিল রাখা। অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা তোমরা এমন কথা কেন বল যে কাজ তোমরা কর না। (সূরা সফ, আয়াত ২)

(চ) দায়ীকে জ্ঞানগত দিকে শ্রেষ্ঠ হওয়া।

(ছ) দায়ীকে টার্গেটকৃত ব্যক্তির মন মানসিকতা ও অবস্থার প্রতি নজর রাখা।

(জ) দাওয়াতকে সহজরূপে দাওয়াত পেশকারী হওয়া।

(ঝ) আদর্শের পুর্নাঙ্গ জ্ঞান এবং সে অনুযায়ী চরিত্র ও কর্ম থাকা।

(ঞ) দাওয়াতী কাজের টার্গেট থাকবে একটাই-'আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন'।

(ট) কঠোর পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল হবেন।

(ঠ) উদার মনের তথা বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হবেন।

(ড) সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করা।

(ঢ) চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলা, কম কথা বলা ও কৃত্রিমতা পরিহার করা।

(ণ) ভাষা সহজ সরল, যুক্তি ভিত্তিক ও সুন্দর হওয়া। যেমন- মূসা (আঃ) এর দোয়া।

(ত) দায়ীর কথা ইতিবাচক হবে; নেতিবাচক নয়।

(থ) কারো বিরুদ্ধে কথা না বলা।

(দ) মন-মানসিকতা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে কথা বলা।

(ধ) তাড়া-হুড়ো পরিহার করা।

এছাড়া দাঈর মধ্যে আরও ৮টি খাস সিফাত থাকতে হবে। এগুলো হলো-

(ক) উম্মতের প্রতি মুহাব্বত

(খ) নিজের সংশোধনের নিয়ত

(গ) জানমাল ও সময় কুরবানী করার জযবা

(ঘ) বাহাদুরী ও বড়াই দিল থেকে মুছে ফেলা

(ঙ) দিলে আজিজি ও ইনকেছারী পয়দা করা

(চ) লোকেরা দাওয়াত কবুল না করলেও নিরাশ না হওয়া

(ছ) অন্যের পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্টের সময় সবর করা ও

(জ) প্রত্যেক নেক আমলের পর ইস্তিগফার করা

দাওয়াত দেওয়ার কৌশলসমূহঃ

(ক) বিনয়ের মাধ্যমে দাওয়াত

اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ○ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ○

অর্থাৎ আপনারা দুইজন ফিরআউনের কাছে যান। নিশ্চয় সে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছে। তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবেন। হয়তো সে উপদেশ কবুল করবে অথবা ভয় পাবে। (সূরা ত্বাহা: আয়াত-৪৩-৪৪)

(খ) বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে দাওয়াত

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থাৎ আপনি পালনকর্তার পথের দিকে আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও শুনিয়ে উত্তম রুপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালন কর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তার পথ থেকে বিচ্যুতি হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে যারা সঠিক পথে আছে। (সূরা নাহল, আয়াত-১২৫)

(গ) মন্দের মোকাবেলায় ভাল দিয়ে দাওয়াত

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থাৎ ভাল ও মন্দ সমান নয়। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। (সূরা হামিম সিজদাহ, আয়াত-৩৪)

মর্যাদাবান ব্যক্তির মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে দাওয়াত দান

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ○اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ○

অর্থাৎ তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও, কেননা সে সীমালংঘনকারী হয়ে গেছে। তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে; সম্ভবতঃ সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ভয় পেয়ে যাবে। (সূরা ত্বাহা, আয়াত-৪৩,৪৪)

(ঘ) মন-মেজাজ লক্ষ্য করে পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ

(ঙ) প্রতিবাদী পরিবেশে নয়, অনুকুল পরিবেশে দাওয়াত দান

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

অর্থাৎ তুমি যখন দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াত সমুহের দোষ সন্ধান করতেছে তখন তাদের নিকট হতে সরে যাও যতক্ষণ না তারা এ প্রসংগের কথা-বার্তা বন্ধ করে অপর কোন কাজে মগ্ন হয়। (সূরা আন'আম,আয়াত-৬৮)

(চ) অন্যমনস্ক ব্যক্তির কাছে দাওয়াত না দেয়া

(ছ) যুক্তি প্রমাণ পেশ করার সময় ব্যক্তির যোগ্যতার দিকে খেয়াল রাখা

আরও বিস্তারিতভাবে,

১. জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে দাওয়াতের পদ্ধতির উন্নতি করা

عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ○الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ○

অর্থাৎ পড়, তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না। (সূরা আলাক, আয়াত-৩,৪,৫)

২. নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করার মাধ্যমে দাওয়াত

- সাধারণ দাওয়াত
- চিঠি-পত্রের মাধ্যমে দাওয়াত
- বই পড়ানোর মাধ্যমে দাওয়াত
- সমস্যার সমাধান দেখিয়ে দাওয়াত
- মিডিয়ার মাধ্যমে দাওয়াত (প্রিন্টিং ও ইলেক্ট্রনিক্স)
- 'ইন্টারনেট', 'ফেসবুক' ইত্যাদির মাধ্যমে দাওয়াত
- আল্লাহর ক্ষমতা মাহাত্ম্য প্রমাণের মাধ্যমে দাওয়াত

৩. সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে দাওয়াত

৪. মর্যাদার পরিপন্থি পদ্ধতি পরিত্যাগের মাধ্যমে দাওয়াত

- আত্ম-মর্যাদা রক্ষা করা
- ইসলামকে হেয় না করা
- শরিয়তের পরিপন্থি কাজ না করা
- ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ না করা
- পরিবেশ পরিস্থিতি বোঝা

৫. জনগণের ভাষায় দাওয়াত দান করা

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

অর্থাৎ এবং আমরা যখন যেখানেই কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, তিনি তার জাতির জনগণের ভাষায়ই সে পয়গাম পৌঁছিয়েছেন, যেন তিনি তাদেরকে খুব ভালো ভাবেই কথা প্রকাশ করে বলতে পারেন, অতঃপর আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করেন আর যাকে চান হেদায়াত দান করেন, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও কৌশলী। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৪)

(চ) সহজভাবে দাওয়াত প্রদান

عَنْ اَنَسٍ (رض)قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَسِّرُوْا وَ لَا تُعَسِّرُوْا وَ بَشِّرُوْا وَ لَا تُنَفِّرُوْا

অর্থাৎ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা (দ্বীনের দাওয়াত) সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। (বুখারী ও মুসলিম)

ছ. উদ্দেশ্যের পরিপন্থি পদ্ধতি পরিত্যাগ করা

- বাড়াবাড়ি
- অহেতুক তর্ক -বিতর্ক
- ফতোয়াবাজী

৯. দাওয়াহ-এর গুরুত্ব:

দাওয়াত এর গুরুত্ব সমন্ধে কুরআনে বহুবার জোর দেওয়া হয়েছে :

“যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? ”

“তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। ”

“আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।”

“আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়।

ইসলামের প্রচার-প্রসার করাই মুসলমানদের সেরা বৈশিষ্ট্য। মহানবী (ﷺ)-এর পর যেহেতু আর কোনো নবী আসবেন না, তাই এ দায়িত্ব তাঁর অনুসারীদের কাঁধেই অর্পিত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির কল্যাণেই তোমাদের উদ্ভব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করো, অন্যায় কাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখো। (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

ইসলামের পথে মানুষকে আহ্বানকারীর কথাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথা আখ্যা দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। এরশাদ হয়েছে, তার কথার চেয়ে কার কথা আর উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, সৎ কাজ করে এবং বলে—নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (হামিম সাজদাহ: ৩৩)

মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা এবং ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া পরকালে সফল হওয়ার পথ। আল্লাহ তাআলা বলেন, এরপর (আল্লাহর সন্তুষ্টি তারাও লাভ করবে) যারা ইমান আনে, পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরে দয়ার উপদেশ দেয়—তারাই ডানপন্থী, তারাই সফল। (সূরা বালাদ: ১৭)।

যারা ইসলামের প্রসার-প্রচারে কাজ করবে, তাদের দাওয়াতে যারা ইসলামের পথে আসবে এবং আমল করবে, সব আমলের সওয়াবের সমপরিমাণ আল্লাহ তাআলা সেই প্রচারককেও দান করবেন। হাদিসে মহানবী (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে ডাকবে, তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তিদের সমপরিমাণ নেকি থাকবে। তবে তাদের নেকি থেকে বিন্দু পরিমাণও কমানো হবে না। অন্যদিকে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার পথে ডাকবে,

তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তিদের সমপরিমাণ পাপ থাকবে। তবে তাদের পাপ থেকে বিন্দু পরিমাণও কমানো হবে না। (মুসলিম)

ইসলামি দাওয়াত মানব জাতির পরিবর্তন ও হেদায়াতের জন্য প্রয়োজন। আর এই মানব জাতির মঙ্গলের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নবী-রাসূল এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সেই নবী-রাসূল মানব জাতির কাছে গিয়ে মহান প্রভুর পরিচয় তুলে ধরে ইসলামের পথে দাওয়াত দিয়েছেন। সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান করাই ছিল নবী-রাসূলদের কাজ। সব নবীই তার উম্মতকে তাওহিদ ও ইবাদতের আদেশ করেছেন এবং শিরক ও বিভিন্ন পাপ কাজে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যিনি উম্মি নবী; যার উল্লেখ তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজিলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদের সৎ কাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন। (সূরা আরাফ-১৫৭)

ইসলামি দাওয়াত প্রদান করা তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা সব মুসলমানের ওপর অবশ্য কর্তব্য। উম্মতে মোহাম্মদির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো দাওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দিন প্রতিষ্ঠা বা নসিহতের দায়িত্ব। এই দিনি দাওয়াত যে ব্যক্তি পালন করবে, সে সফলতা অর্জন করবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যেন তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর তারাই সফলকাম'। (সূরা ইমরান-১০৪)

প্রত্যেক ব্যক্তির আওতাধীন সব লোকের ওপর দিনি দাওয়াত দেওয়া অবশ্যক। পরিবারের কর্তার জন্য তার স্ত্রী-সন্তানদের দিনের দাওয়াত দিয়ে ইসলামের শারিয়া মোতাবেক পরিচালনা করা, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও স্কুলের প্রধানগণ তার সহকারী ও শিক্ষার্থীদের, মিল-ফ্যাক্টরি বা বিভিন্ন গার্মেন্টস বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ তার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের, এলাকার মেম্বার-কমিশনার, চেয়ারম্যান, এমপি, মন্ত্রী কিংবা শাসকগণ যার যার অধীনস্থ সবাইকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রদান করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়ের জন্য দাওয়াত

দেবেন। কেননা, রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমরা প্রত্যেকেই জিম্মাদার এবং তোমাদের প্রত্যেকেই অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। (বুখারি শরিফ)

দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে কাউকে ছোট করা যাবে না। সুন্দর ও ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ সম্পাদন করতে হবে। কখনো কাউকে প্রতিপক্ষ ভাবা ঠিক হবে না। সর্বদা ভুলত্রুটি থেকে সচেতন থাকতে হবে। ভুল হলে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। কোনো ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ অন্তরে স্থান দেওয়া যাবে না। সবাইকে বন্ধু ভেবে দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে, তুমি এমন উত্তমভাবে মন্দের মোকাবিলা করবে, যাতে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা রয়েছে, সে-ও প্রাণের বন্ধু হয়ে যায়। (সূরা হামিম সাজদাহ, আয়াত:৩৪)।

ইসলামের বিকল্প নেই। ইসলামের দাওয়াত কখনো প্রান্তিক হতে পারে না। কেবল ইতিবাচক বিষয়গুলো দাওয়াত কিংবা শুধুই নেতিবাচক বিষয়ের দাওয়াত। দাওয়াতের বিষয় হতে হবে ঈমান, আমল, তাওহিদ, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি।

মুসলিম অমুসলিম সকলের নিকট দা'য়ী ইলাহ দ্বীনি দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে। আজকের অবস্থা এমন হয়েছে যে, যারা সংগঠন করেন তারা মনে করেন সংগঠকরাই দাওয়াতি কাজ করেন, যারা মাদরাসায় পড়েন বা পড়ান তারা মনে করে মাদ্রসার ভিতরেই দাওয়াত সীমাবদ্ধ, যারা তাবলীগ করেন তারা মনে করেন আমরা তাবলীগের মাধ্যমেই কেবল ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। আমাদের সমাজে আজ একগুয়েমী বেশি বিস্তার করছে। যারা লেখালেখী করেন, তারা মনে করেন আমরা শুধু লেখালেখির মাধ্যমেই ইসলামের কাজ করছি তাবলীগ, সংগঠনের আর দরকার কি!

দাওয়াতি কাজের অনেক পদ্ধতি আছে। বাস্তবতা হচ্ছে যারা তাবলীগ করেন, যারা মাদ্রাসায় পড়েন বা পড়ান, যারা সংগঠন করেন, যারা লেখালেখি করেন তারা সকলেই দ্বীনের কাজই তথা ইসলামের পথে মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন।

আজ চিন্তার বিষয় তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে অমুসলিমরা যেভাবে তাদের ধর্মীয় দাওয়াত সারা বিশ্বে প্রচার করছে আমরা কি পারছি তাদের মত দাওয়াতি কাজ করতে? তারা

ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ফেসবুক, ব্লগ, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ধর্মের দাওয়াত চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন তথ্যসূত্র ও গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমান বিদ্বেষী প্রচারকার্যে ইহুদীদের রয়েছে সাড়ে আট লক্ষেরও বেশি ইন্টারনেট ভিত্তিক ওয়েবসাইট। আর খ্রিস্টানদের প্রতারণায় রয়েছে প্রায় ৫ লক্ষের চেয়েও বেশি ওয়েবসাইট। আর অন্যান্য অমুসলিমদের প্রতারণায় রয়েছে প্রায় ৪ লক্ষের বেশি ওয়েব সাইট। ইহুদী খ্রিস্টানরা এসব ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় প্রচারকার্যে খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আর তার সাথে সাথে প্রচার ও প্রসার করছে মুসলমান ও কুরআন সুন্নাহ বিরোধী মিথ্যা মতবাদ। তথ্য প্রযুক্তির উৎকষতার এ যুগে মুসলিম উম্মাহ আজ চরম বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

প্রচারের অভাব ও দাওয়াতি কাজের দুর্বলতার কারণে দেশের বিভিন্ন এলাকাতে এনজিওরা সরলমনা মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করছে। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি যে হারে বেড়েছে এ প্রেক্ষাপটে অধিকহারে ইসলামের দাওয়াত তথা তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাতসহ জীবনবীধানের উপযোগী ও আপরিহার্যতা মানুষের সামনে তুলে ধরা খুব বেশি প্রয়োজন ও সময়ে দাবি।

ইসলামের দাওয়াতের সারকথা হচ্ছে, মানুষকে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির দিকে আহবান করা।

ইসলামের আবির্ভাব শুধু ব্যক্তির কল্যাণের জন্য নয়; সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ইসলাম। আর ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সৌভাগ্য দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল: সালাহ ও ইসলাহ। অর্থাৎ নিজে সংশোধন হওয়া এবং অন্যকে সংশোধন করা। দাওয়াতের কাজ ছাড়া যা কখনো সম্ভব নয়।

দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব ও ফযীলত এত অধিক, যা কোনো মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুধাবন করতে পারে না। পবিত্র কালামের অসংখ্য আয়াত যার উজ্জ্বল সাক্ষী। আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে ভালো কথা আর কার হতে পারে,

যে আল্লাহর প্রতি আহবান করেছে, সৎ কাজ করেছে এবং বলেছে, আমি অনুগতদের একজন? (সূরা হামীম আসসাজদাহ : ৩৩)

আল্লামা শাববীর আহমদ উছমানী রাহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, এই আয়াতে ঐ সকল বিশেষ প্রিয়ভাজন বান্দার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা একক আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেদের স্থিরতা ও দৃঢ়তার প্রমাণ দিয়েছে। এখানে তাদের অপর একটি উচ্চ মর্যাদার কথা আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ উত্তম ও উৎকৃষ্ট লোক সেই ব্যক্তি যে একমাত্র আল্লাহর জন্য নিজেকে নিবেদিত করে তাঁর আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের ঘোষণা দেয়, তাঁর মনোনীত পথে চলে এবং দুনিয়াবাসীকে তাঁর দিকে আসার আহবান জানায়। তার কথা ও কাজ অন্যদেরকে আল্লাহর পথে আসার জন্য প্রভাবিত করে। লোকজনকে সে যে সকল ভালো কাজের দাওয়াত দেয় সে নিজেও সেগুলো আমল করে। আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের ঘোষণা প্রদানে কোন সময়ে কোন স্থানে সামান্যতম সংকোচও বোধ করে না। তার জাতীয় পরিচিতি শুধু ইসলাম। সকল প্রকারের সংকীর্ণতা ও গোষ্ঠীপ্রীতি ত্যাগ করে নিজে খাঁটি মুসলমান হওয়ার ঘোষণা প্রদান করে এবং যার দাওয়াত দেওয়ার জন্য সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দন্ডায়মান হয়েছিলেন এবং যার জন্য সাহাবায়ে কিরাম রাঃ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সূরা নাহল-এ আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) ডাক স্বীয় প্রতিপালকের পথে পরিপক্ক কথা বুঝিয়ে এবং উত্তমরূপে উপদেশ শুনিয়ে। আর তাদেরকে বিতর্কে নিরুত্তর কর উত্তম পন্থায়।

এই আয়াতে খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালীম দেওয়া হচ্ছে মানুষকে কিভাবে পথে আনতে হবে। এর তিনটি পন্থা বলা হয়েছে। ক) হিকমত, খ) মাওইযা হাসানা ও গ) জিদাল বিল্লাতী হিয়া আহসান।

হিকমত অর্থাৎ মযবূত দলিল-প্রমাণের আলোকে হিকমত ও প্রজ্ঞাজনোচিত ভঙ্গিতে অত্যন্ত পরিপক্ক ও অকাট্য বিষয়বস্তু পেশ করতে হবে, যা শুনে সমঝদার ও জ্ঞানবান

রুচিসম্পন্ন লোক মাথা ঝুঁকিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দুনিয়ার কাল্পনিক দর্শনাদি তার সামনে ম্লান হয়ে যায়। কোনো রকম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার বিকাশ যেন ওহী বর্ণিত তত্ত্ব ও তথ্যকে পরিবর্তন করতে না পারে।

মাওইযা হাসানা-এর দ্বারা মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশকে বোঝানো হয়েছে, যা কোমল চরিত্র ও দরদী আত্মার রস ও আবেগে থাকবে পূর্ণ। নিষ্ঠা, সহমর্মিতা, দরদ ও মধুর চরিত্র দিয়ে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় যে নসীহত করা হয় তাতে অনেক সময় পাষাণ-হৃদয়ও মোম হয়ে যায়, মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার হয় এবং একটি হতাশ ও ক্ষয়ে যাওয়া জাতি গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। মানুষ ভয়-ভীতি ও আশাব্যঞ্জক বক্তব্য শুনে লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে চলে প্রবল বেগে, বিশেষত যারা অতটা সমঝদার, ধীমান ও উচ্চ মেধা-মস্তিষ্কের অধিকারী নয়, অথচ অন্তরে সত্য-সন্ধানের স্পৃহা প্রবল, তাদের হৃদয়ে মনোজ্ঞ ওয়ায-নসীহত দ্বারা এমন কর্ম-প্রেরণা সঞ্চার করা যায়, যা উঁচু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সম্ভব হয় না।

হ্যাঁ, দুনিয়ায় সব সময় একটা দল এমনও থাকে, যাদের কাজই হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করা এবং কথায় কথায় হুজ্জত করা ও কূটতর্কে লিপ্ত হওয়া। এরা না হিকমতপূর্ণ কথা কবুল করে, না ওয়ায-নসীহতে কান দেয়। তারা চায় প্রতিটি বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের ময়দান উত্তপ্ত হোক। অনেক সময় প্রকৃত বোদ্ধা, ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যানুসন্ধিৎসু স্তরের লোকদেরও সংশয়-সন্দেহ ঘিরে ধরে, আলোচনা-পর্যালোচনা ছাড়া তখন তাদেরও সন্তোষ লাভ হয় না। তাই বলা হয়েছে-আর তাদেরকে বিতর্কে নিরুত্তর কর উত্তম পন্থায়।

অর্থাৎ কখনো এমন অবস্থার সম্মুখীন হলে তখন উৎকৃষ্ট পন্থায় সৌজন্য ও শিষ্টাচার এবং সত্যানুরাগ ও ন্যায়-নিষ্ঠতার সাথে তর্ক-বিতর্ক কর। প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করতে চাইলে তা উত্তম পন্থায় কর। অহেতুক বেদনাদায়ক ও কলজে-জ্বালানো কথাবার্তা বলো না, যা দিয়ে সমস্যার কোনো সূরাহা হয় না; বরং তা আরও প্রলম্বিত হয়। উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করা ও সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। রুক্ষতা,

দুর্ব্যবহার, বাক-চাতুর্য ও হঠকারিতা কখনো সুফল দেয় না। (তাফসীরে উছমানী ২/৬২৮-৬২৯)

অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-(তরজমা) মহাকালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নহে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়। (সূরা আসর)

অর্থাৎ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের চারটি জিনিস প্রয়োজন : ক) আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং তাদের হিদায়াত ও প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা-তা দুনিয়া সম্পর্কিত হোক, কিংবা আখিরাত সম্পর্কিত। খ) সেই ঈমান ও ইয়াকীনের প্রভাব কেবল মন-মানস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রাখা; বরং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তা প্রকাশ করা এবং বাস্তব জীবনে আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটানো। গ) কেবল নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার ও কল্যাণ নিয়েই তুষ্ট না থাকা, বরং দেশ ও জাতির সামষ্টিক স্বার্থকেও সম্মুখে রাখা। দুজন মুসলমান একত্র হলে নিজের কথা এবং কাজের দ্বারা একে অপরকে সত্য দ্বীন মেনে চলার এবং প্রতিটি কাজে সত্য ও সততা অবলম্বনের তাকীদ করা। ও ঘ) প্রত্যেকে একে অপরকে এই নসীহত ও ওসীয়ত করা যে, সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় সংস্কার-সংশোধনের ক্ষেত্রে যত বাধা-বিপত্তি, যত অসুবিধা ও বিপদাপদ দেখা দিবে, এমনকি যদি মন-মানসের বিরোধী কাজও বরদাশত করতে হয় তাহলেও ধৈর্য্য ও সবরের সঙ্গে তা বরদাশত করতে হবে। পুণ্য ও কল্যাণের পথ থেকে পা যেন কখনো ফসকে না যায় এই ওসীয়ত করতে হবে। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যে এই চারটি গুণের সমাবেশ ঘটবে এবং যিনি নিজে পূর্ণাঙ্গ হয়ে অন্যদেরকে পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা চালাবেন, কালের পৃষ্ঠায় তিনি অমর হয়ে থাকবেন। আর এমন ব্যক্তি যেসব নিদর্শন রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন তা 'বাকিয়াতে সালেহাত' তথা অবশিষ্ট নেক কাজ হিসেবে সর্বদা তার নেকীর খাতায় সংযোজন ঘটাবে। বস্তুত এই ছোট সূরাটি সমস্ত দ্বীন ও হিকমতের সার-সংক্ষেপ। ইমাম শাফেয়ী রাহ. যথার্থ বলেছেন যে, কুরআন মজীদে কেবল যদি এই সূরাটিই নাযিল করা হতো, তাহলে (সমঝদার) বান্দাদের হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট ছিল। পূর্বকালের মনীষীদের মধ্যে

দুজন একত্র হলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় তারা একে অপরকে সূরাটি পাঠ করে শুনাতেন। (তাফসীরে উছমানী ৪/৭৪৫)

আল্লাহ তাআলা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন- তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতেই হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। আর তারাই সফলকাম। (সূরা আল ইমরান)

সূরা যারিয়াতে (আয়াত : ৫৫) আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) আর তুমি বুঝাতে থাক। কারণ বুঝানো ঈমানদারদের উপকারে আসে।

অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আপনি পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। এখন আপনার অত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সত্য না মানার যা দোষ তা সত্যদ্রোহীদের উপরই বর্তাবে। তবে বুঝোনো আপনার দায়িত্ব। তাই দাওয়াত ও তাবলীগের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখুন। যার ভাগ্যে ঈমান আছে আপনার উপদেশে সে উপকৃত হবে, ঈমান আনবে এবং যারা ইতিপূর্বে ঈমান এনেছে তারা আরও বর্ধিত হারে উপকৃত হবে। আর অস্বীকারকারীদের জন্য আল্লাহর প্রমাণ পূর্ণ হবে। (তাফসীরে উছমানী ৪/৩২১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ করে আল্লাহ তাআলা বলেন- (তরজমা) হে বস্ত্রাবৃত! উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (সূরা মুদ্দাসসির : ১-৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য এত ফিকির করতেন এবং উদ্বিগ্ন থাকতেন যে, আল্লাহ তাআলা তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন-(তরজমা) তারা যদি এ বিষয়ে বিশ্বাস না করে তবে তাদের পেছনে মনস্তাপ করতে করতে হয়ত তুমি প্রাণপাত করবে। (সূরা কাহফ : ৬)

অর্থাৎ এই কাফিররা যদি কুরআনের কথা না মানে, তো আপনি তাদের দুঃখে বিলকুল পেরেশান হবেন না। আপনি দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আদায় করেছেন ও করে

যাচ্ছেন, কেউ না মানলে আপনার অতটা মর্মাহত ও চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই ভেবে অনুতাপ করাও সমীচীন নয় যে, আমি এমন মেহনত কেন করলাম যা সফল হল না? আপনি সর্বাবস্থায় সাফল্যমন্ডিত। দাওয়াত ও তাবলীগ এবং মানবতার প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার যে কাজ আপনি করছেন তা আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক। হতভাগার দল কবুল না করলে ক্ষতি তাদেরই। (তাফসীরে উছমানী ২/৭০১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হওয়ার কারণে আমাদের উপরও দাওয়াতের কাজ জরুরি। যেমন সূরা ইউসুফে আল্লাহ তাআলা বলেন-(তরজমা) বল, এই আমার পথ। আল্লাহর দিকে ডাকি বুঝে-শুনে আমি এবং যারা আমার সঙ্গে আছে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শরীক সাব্যস্তকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা ইউসুফ : ১০৮)

অর্থাৎ এই খাঁটি তাওহীদের পথই আমার পথ। আমি বিশ্ব মানবতাকে আহবান করি যে, সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা ছেড়ে এক আল্লাহর অভিমুখী হও এবং তাঁর তাওহীদ, তাঁর গুণাবলি ও বিধি-বিধান ইত্যাদির বিশুদ্ধ জ্ঞান বিশুদ্ধ পন্থায় অর্জন কর। আমি ও আমার সঙ্গীগণ অকাট্য দলিল-প্রমাণ এবং বিশুদ্ধ উপলব্ধি ও ব্যুৎপত্তির আলোকে এই সত্য সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে এক আলো দান করেছেন, যাতে সব সাথীর দেল-দেমাগ সমুজ্জ্বল হয়ে গেছে। কারও অন্ধ অনুকরণ নয়, বিশুদ্ধ তাওহীদের পথচারী প্রতিটি কদমে তার মন-মানসে আল্লাহর মারিফত ও অর্ন্তদৃষ্টির বিশেষ জ্যোতি ও পরম দাসত্বের স্বাদ উপলব্ধি করে অবচেতন মনে বলে ওঠে-আল্লাহ পবিত্র। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (তাফসীরে উছমানী ২/৪৫৯)

আল্লাহ তাআলা আমাদের দাওয়াত ইলাল্লাহর গুরুত্ব বোঝার এবং সঠিকভাবে এ দায়িত্ব পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমরা দাই' জাতি। আমাদের জন্য দাওয়াহ ফরজে কিফায়া। আমরা যারা নিজেদের আল্লাহর দ্বীনের ধারক-বাহক মনে করি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আদর্শ রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীরা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। জ্ঞান আছে কিন্তু তার মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা নাই, সে অহংকারী হবে, কখনোই ঈমানের স্বাদ পাবে

না। আবার যার মধ্যে emotion, তাকওয়া বা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আছে কিন্তু জ্ঞান নাই, সে বিভ্রান্ত-কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা অন্ধ হবে। সে দিন শেষে আল্লাহর সন্তুষ্টির বদলে অসন্তুষ্টি অর্জন করবে, অথচ সে জানবেও না। তাদরেকে সহজেই অল্প যুক্তি দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করা সম্ভব। আবার কারও মধ্যে এই দুইটি বিষয়ই আছে কিন্তু সঠিক দিকনির্দেশনা নেই, সেও নিজে ভুল আদর্শ গ্রহণ করবে ও মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাবে। জীবন আদর্শ হিসেবে দাই' বা কোনো আলেম যাতে আমাদের আদর্শ না হয়, আল্লাহর রাসূলই শুধু আমাদের আদর্শ হবেন। বাহ্যত দাই' যত বড় জ্ঞানী আলেম, উত্তম আখলাক ও আল্লাহ ভক্ত ব্যক্তি হোন না কেন, তিনি কখনোই perfect নন। আমাদের অজানা অনেক আল্লাহর হুকুম বা উপদেশ সে দাই' পালন করেন না অথবা সেই আদেশের গুরুত্ব বা মর্ম বুঝেন না; সুতরাং আদর্শ হিসেবে আল্লাহর প্রদত্ত আদর্শ অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি ﷺছিলেন আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী, তাঁকে পাঠানো হয়েছিলো দুনিয়ার মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে কেবল আল্লাহর গোলামিতে ন্যস্ত করতে ।

১০. রাসূল (ﷺ) এর দাওয়াতি মিশন:

রাসুলুল্লাহর (ﷺ)এর প্রতিটি আচার-আচরণই আমাদের জন্য অনুকরণীয়। তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্যায় ও ধাপ ছিল আলোকবিভায় উদ্ভাসিত। আলোর এ ফোয়ারা থেকে কেউ ছিটেফোঁটা আহরণ করলেও সাফল্যের দিগন্তচূড়ায় পৌঁছে যেতে পারবে অনায়াসে। নবী জীবনের প্রধান মিশন ছিল দিগ-দিগন্তে আসমানি বার্তা ছড়িয়ে দেয়া। যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূলরা যে শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন সেগুলোর পূর্ণতা দেয়া। এ জন্য পৃথিবীতে প্রেরিত সব নবী-রাসুলের কর্মের ক্ষিপ্রতা ও কৌশল একা রাসুলুল্লাহর (ﷺ) আয়ত্তাধীন ছিল। কারণ আল্লাহ তাঁকে এমন অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান করেছিলেন, যা অন্য কোনো নবী-রাসুলের ছিল না।

দ্বীনের প্রচার-প্রসার ছিল রাসুলুল্লাহর (ﷺ) জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ। তাঁর দায়িত্বের পরিধি যেমন অন্য নবী-রাসুলের তুলনায় ব্যাপৃত ছিল, তেমনি দায়িত্বানুভূতিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি তাঁর দাওয়াতি মিশনে সাফল্যের শীর্ষ চূড়া স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে দায়িত্ব ও কর্মের ভার তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল, তিনি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাঁর এ সফলতার নেপথ্যে ছিল আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব। নিঃসম্বল ও অনাড়ম্বরভাবে মক্কায় ইসলামের যে আদর্শ অঙ্কুরিত হয়েছিল মদিনায় তা বিশাল মহীরুহে রূপ লাভ করে। শক্তি ও প্রাচুর্যের বলে নয়, আদর্শই ছিল এর মূল প্রাণশক্তি। রহমতের আধার ও শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী মহানবী (ﷺ) দ্বীনের এ মহান দায়িত্ব পালন করতে সামান্য সময়ের জন্যও আদর্শচ্যুত হননি। তিনি মন্দের জবাব দিয়েছেন ভালো দিয়ে। বিশাল ক্ষমতা হাতে পেয়েও প্রতিপক্ষকে অনৈতিকভাবে ঘায়েল করার ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করেননি।

রাসুলুল্লাহর (ﷺ) দাওয়াত পদ্ধতি ছিল অনুপম, নীতি ও আদর্শে বলীয়ান। মানবতাকে পরিশীলিত করার নিরন্তর যে প্রয়াস তাঁর মধ্যে কার্যকর ছিল, এর কোনো নজির পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত দেখা যায় না। পৃথিবীময় শান্তির সুবাস ছড়িয়ে দেয়াই ছিল তাঁর মিশন ও ভিশন। আদর্শিক ও ফলপ্রসূ দাওয়াত পদ্ধতির কারণেই তাঁর দ্বীন অল্প সময়ে বিশ্ব জয় করতে সক্ষম হন। তাঁর কৌশল ও সাধনার ফলেই তা চিরন্তনতা লাভ করে। কেয়ামত পর্যন্ত এ দ্বীন টিকে থাকবে তাঁর আদর্শের অফুরন্ত শক্তির গুণে, স্থূল কোনো সামর্থ্যে নয়। দ্বীনের আলোকশিখা যতদিন মিটমিট করে জ্বলবে, ততদিন জয় হবে আদর্শের, আদর্শকামী মানুষের। কারণ বাহ্যিক উপকরণ কখনোই আদর্শের সমকক্ষ হতে পারে না।

শিশুকাল থেকেই মুহাম্মদ (ﷺ) ছিলেন একজন ব্যতিক্রম বালক। কথা-বার্তা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে তিনি উত্তম আদর্শবান হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন। ছোট বেলায় তাঁর দাদা বড় বড় মজলিসে মুহাম্মদ (ﷺ) কে নিজ চাদরের উপর বসাতেন। আরবের কুরাইশ নেতাদের সামনে তাঁকে সাইয়েদ বা নেতা বলে ডাকতেন। (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া) এ ছাড়া যখন তিনি হালিমা সাদিয়ার ঘরে লালির-পালিত

হচ্ছিলেন তখন তিনি অন্যান্য বালকদের মত কথা না বলে শুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলতেন। ইসলাম আগমনের পূর্বে আরেব যে শির্ক ও মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল, সে সময়েও রাসূল (ﷺ) তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বন করেন। তিনি কখনো কোন মূর্তির সামনে মাথানত করেননি, মূর্তির নামে পশু যবেহ করেননি এবং যবেহকৃত পশুর গোশতও তিনি কোনদিন ভক্ষণ করেননি। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁকে এসব কাজ থেকে হিফাজত করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম (ﷺ) কে নবুওয়াতের সুসংবাদ প্রদান করেন। হেরাগুহায় থাকা কালীন একদিন জিবরাইল (আ.) এসে বললেন,

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

অর্থাৎ পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড থেকে। পড়–ন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। (সূরা আল-আলাক-১-৫)

এরপর রাসূল (ﷺ) ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরে গেলেন। খাদীজাকে ডেকে বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। তিনি খাদীজার নিকট পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং নিজের জীবন নিয়ে আশঙ্কার কথা বললেন। খাদীজা (রাঃ) তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন,

كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

অর্থাৎ না, তা কখনও হতে পারে না। আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে লাঞ্চিত, অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ়কারী, গরীব-দুঃখীর সাহায্য-সহযোগিতাকারী, অতিথীপরায়ন ও মানুষের বিপদে-আপদে সাহায্যকারী। (সহীহ আল-বুখারী) এর পরে সূরা আল-মুদ্দাচ্ছিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে রাসূল (ﷺ) দাওয়াতী কাজ শুরু করেন।

রাসুলুল্লাহর (ﷺ) সময় দাওয়াতের সূচনা হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ের পথনির্দেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত বাণীতে সমন্বিত ছিলো স্বচ্ছ ঝরঝরা, অত্যন্ত মিষ্টি মধূর, অতিশয় প্রভাব বিস্তারকারী এবং যাদের লক্ষ্য করে তা বলা হচ্ছিলো তাদের রুচি অনুযায়ী উন্নত সাহিত্যিক ভূষণে সজ্জিত। ফলে তা শ্রোতাদের হৃদয়মনে তীর শলাকার মতো বিদ্ধ হতো; সুমধূর ভাব সামঞ্জস্যের কারণে লোকেরা আত্মহারা হয়ে তা উচ্চারণ ও আবৃত্তি করতে শুরু করতো। সর্বোপরি তাতে স্থানীয় ভাবধারার বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান ছিলো। যদিও আলোচনা করা হতো চিরন্তন সত্যের কিন্তু তার সত্যতা প্রমাণের জন্যে যুক্তি প্রমাণ, সাক্ষ্য ও উদাহরণ গৃহীত হতো নিকটস্থ পারিপার্শিক সমাজ থেকেই, যেসবের সাথে শ্রোতামন্ডলীর ছিলো নিগুঢ় পরিচিতি। তাদেরই ইতিহাস, তাদের জাতীয় ঐতিহ্য, তাদেরই দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণাধীন নিদর্শনসমূহ ও তাদেরই আকিদা বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র এবং সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে তাতে আলোচনা হতো। যাতে করে তারা এর দ্বারা তীব্রভাবে প্রভাবিত হয়। (এর মধ্যে তিন বছর ছিলো গোপন দাওয়াতের পর্যায়)। এ অধ্যায় নবী করীম (ﷺ)-এর দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া তিনভাবে প্রকাশিত হয়ঃ

(ক) কতিপয় সৎ ও সত্যপন্থী লোক এ দাওয়াত কবুল করে মুসলিম উম্মায় সংঘবদ্ধ হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

(খ) একটা বিরাট সংখ্যক লোক মূর্খতা, স্বার্থপরতা অথবা বংশানুক্রমিক পূর্বপুরুষের প্রচলিত প্রথার অন্ধ প্রেমে মশগুল হয়ে তার বিরোধীতা করতে বদ্ধপরিকর হয়।

(গ) কুরাইশ ও মক্কার পরিসীমা অতিক্রম করে এ নতুন দাওয়াতের আওয়াজ অপেক্ষাকৃত বিশাল ক্ষেত্রে পদার্পণ করে।

এরপর থেকেই শুরু হয় এ দাওয়াতের দ্বিতীয় অধ্যায়। এ অধ্যায়ে ইসলামি দাওয়াতের সাথে প্রাচীন জাহেলিয়্যাতের এক তীব্র প্রাণান্তকর দ্বন্দ্বের সূচনা হয়, যার জের আট নয় বছরকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। শুধু মক্কাতে নয়, শুধু কুরাইশ গোত্রে নয়, আরবের অধিকাংশ অঞ্চলেই প্রাচীন জাহেলিয়্যাতের সমর্থকরা এ দাওয়াতকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এ দাওয়াতকে নিস্তেজ ও নিস্তনাবুদ করে দেওয়ার

জন্য তারা সর্বোতভাবে চেষ্টা করতে শুরু করে। মিথ্যা অভিযোগ, অপবাদ, দোষারোপ, সন্দেহ সংশয় ও নানাবিধ কূট প্রশ্নের তীব্র আক্রমণ চালাতে থাকে। জনগণের অন্তরে নানা প্রকার প্রচারণা ও প্ররোচণা সৃষ্টি করতে থাকে। অপরিচিত লোকদেরকে নবী করীম (ﷺ)-এর কথা শোনা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে। নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর চরম পাশবিক অত্যাচার নির্যাতন চালাতে থাকে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে। এভাবে তাদের উপর এত অবর্ণনীয় নির্যাতন নিষ্পেষণ চালানো হয় যে, তাদের অনেক লোকই নিজেদের ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করে দু'দুবার হাবশায় হিজরত করতে বাধ্য হয় এবং শেষ পর্যন্ত তৃতীয়বার তাদের সকল্কে মদীনায় হিজরত করতে হয়। কিন্তু তীব্র বিরোধীতা ও ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধকতা সত্বেও এ দাওয়াত ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হতে থাকে। মক্কায় এমন কোন বংশ ও পরিবার ছিলনা যেখান থেকে অন্তত এক ব্যক্তিও ইসলাম গ্রহণ করেনি। ইসলামের অধিকাংশ দূশমনের কঠিন দূশমনির কারণ এই ছিল যে, তাদের নিজেদেরই ভাই, ভাতিজা, পুত্র, জামাই, কণ্যা, বোন ও ভগ্নীপতি ইসলামি দাওয়াত শুধু কবুলই করেনি বরং তারা ইসলামের আত্মোতসর্গী, সাহায্যকারী হয়ে গিয়েছিলো। তাদের নিজেদের কলিজার টুকরো সন্তানরাই তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী হয়ে উঠেছিলো। সর্বোপরি মজার ব্যাপার ছিল যে, যারাই প্রাচীন জাহেলিয়্যাতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এই নতুন মিশনে যোগদান করেছিলো, তারাই জাহেলি সমাজে সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলো। আর এ আন্দোলনে যোগদানের ফলে তারা এত বেশি সৎ, সত্যপন্থী ও পবিত্র নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠেছিলো যে এ বিপ্লবী কাজটাই বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে এ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা সুস্পষ্ট করে তুললো। এ সুদীর্ঘ ও কঠিন দ্বন্দ্ব সংরাম চলাকালে আল্লাহতা'আলা সময় সুযোগ ও প্রয়োজনমতো তার নবীর প্রতি এমন সব আবেগময়ী ভাষণ নাজিল করতে থাকেন, যেগুলোতে বর্তমান ছিলো দরিয়ার উচ্ছ্বসিত শ্রোতবেগ, সয়লাবের দুর্নিবার শক্তি আর আগুনের তীক্ষ্ণ তেজস্বীতা। এসব ভাষণে একদিকে ঈমানদারদেরকে তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের কথা বলে দেয়া হয়। তাদের মধ্যে জামা'আতবদ্ধ জিন্দেগির চেতনা

পয়দা করা হয় এবং তাদেরকে তাকওয়া, চারিত্রিক মাহাত্ম্য, পবিত্র স্বভাব ও পবিত্র জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সত্য দ্বীন প্রচারের কর্মপন্থা তাদেরকে শিখিয়ে দেয়া হয়। সাফল্যের ওয়াদা ও জান্নাতের সুসংবাদ দ্বারা তাদের সাহস যোগানো হয়। ধৈর্য্য, দৃঢ়তা ও উচ্চ সাহসীকতার সাথে আল্লাহর পথে জেহাদ ও সংগ্রাম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। ত্যাগ, কোরবানী ও আত্মোতসর্গের এমন দুর্বার জজবা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দেয়া হয় যে, যাবতীয় বিপদ মুসিবত ও বিরুদ্ধতার গগণচুম্বী তরঙ্গমালার সঙ্গে মুকাবিলা করার জন্যে তারা তৈরি হয়ে যায়। অন্যদিকে বিরুদ্ধবাদী, সত্যবিমুখ ও গাফিলতের ঘুমোঘোরে নিমজ্জিত লোকদের সেসব জাতির ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে সতর্ক করা হয়, যাদের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের ভালোভাবে জানা ছিলো। দিনরাত যেসব ধ্বংসাবশেষ অঞ্চলের উপর দিয়ে তারা যাতায়াত করতো সেসব নিদর্শনের উল্লেখ করে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়। আসমান ও জমিনের যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিনরাত চোখের সামনে প্রতিভাত হতো, যেগুলো তাদের জিন্দেগিতে প্রতিটি মুহুর্তে অবলোকন করতো ও অনুভব করতো, সেসব নিদর্শনাবলী দ্বারাই তৌহিদ ও আখিরাতের প্রমাণ পেশ করা হয়। শিরক, স্বেচ্ছাচারিতা, পরকালের প্রতি অস্বীকৃতি এবং পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের ভ্রান্তি, মনমগজে প্রভাব বিস্তারকারী সুস্পষ্ট দলীল ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হয়। অতঃপর তাদের যাবতীয় সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা হয়। তাদের প্রতিটি প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত জবাব দেয়া হয়। যেসব জটিল সমস্যায় মন জর্জরিত ছিলো অথবা অন্যদের মঙ্কে সংশায়িত করছিলো সেগুলোর সুস্পষ্ট সমাধান পেশ করা হয়। চতুর্দিক থেকে অন্ধ জাহেলিয়্যাতকে এমনভাবে অবরুদ্ধ করা হয় যে, বুদ্ধি ও বিবেকের জগতে অবস্থানের জন্যে তাদের বিন্দু পরিমাণ স্থান থাকেনি। এর সাথে তাদেরকে আল্লাহর গজব ও অভিশাপ, কিয়ামতের ভয়ংকর রুপ এবং জাহান্নামের কঠিন আজাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা হয়। তাদের খারাপ চরিত্র, ভ্রান্ত জীবনযাপন পদ্ধতি, জাহেলি রসম রেওয়াজ, সত্য বিরোধিতা এবং মুমিনদেরকে নির্যাতনের কারণে তাদেরকে ভর্তসনা ও তিরষ্কার করা হয়। নৈতিক চরিত্র ও

সমাজব্যবস্থার যেসব বড় বড় মূলনীতি আল্লাহর মনোনীত সত্যভিত্তিক সভ্যতার ভিত্তি সেগুলো বিস্তারিতভাবে তাদের সামনে পেশ করে দেয়া হয়।

এ অধ্যায়টি এককভাবে বিভিন্ন মঞ্জিল দ্বারা সমন্বিত, যার প্রতিটি মনজিলেই দাওয়াতি কাজ অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রশস্ত হয়ে উঠে। চেষ্টা সাধনা এবং বিরুদ্ধতাও তীব্রতর হতে থাকে। আন্দোলন বিভিন্ন মতাবলম্বী ও পরস্পর বিরোধী কর্মততপর অসংখ্য দল উপদলের সম্মুখিন হয়। তদানুযায়ী আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বাণীসমূহের বিষয় বৈচিত্রও ব্যাপকতর হতে থাকে। ইসলামি দাওয়াতের এ বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে বিস্তারিত পথনির্দেশ প্রদান করা হয় তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, মক্কার ঘোর বিরধিতার যুগে কোন মহান চারিত্রিক শক্তি সম্মুখে অগ্রসর হবার গুহ পরিষ্কার করে এবং কোন প্রভাবশালী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী লোকদেরকে সকল শক্তির সাথে টক্কর লাগাতে এবং সকল মুসিবত অকাতরে সহ্য করতে উদ্বুদ্ধ করে। একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, সার্বিক জীবনে সফলতার জন্য তার কোর'আন হাদীছ অনুসরণ করাই যথেষ্ট। দাওয়াতের দিকটিও এর বাইরে নয়। দাওয়াতি ময়দানে সফল হতে হলে কি প্রক্রিয়ায় কাজ করতে হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা পবিত্র কোর'আনে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদিসেও এ বিষয়টি এসেছে সুস্পষ্টভাবে।

একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, সার্বিক জীবনে সফলতার জন্য তার কোর'আন হাদীছ অনুসরণ করাই যথেষ্ট। দাওয়াতের দিকটিও এর বাইরে নয়। দাওয়াতি ময়দানে সফল হতে হলে কি প্রক্রিয়ায় কাজ করতে হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা পবিত্র কোর'আনে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদিসেও এ বিষয়টি এসেছে সুস্পষ্টভাবে।

আল্লাহতা'আলা খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, তুমি তোমার রবের প্রতি আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সুন্দরতম পন্থায় (আন নাহল, ১২৫)।

দাওয়াত পদ্ধতি কি হবে এবং একজন দাওয়াত কর্মীকে কি কি গুণ অর্জন করতে হবে যা সে দাওয়াতি ময়দানে প্রয়োগ করবে উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। সে দাওয়াত শুরু করবে হিকমত ও পরিবেশ পরিস্থিতির বিবেচনায় বিভিন্ন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে। এখানে হিকমত বলতে বোঝানো হয়েছে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণসমূহ যা স্বচ্ছ ও সন্তোষজনক পন্থায় হক প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অসার ও বাতুলতাকে খন্ডন করবে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহতা'আলা মানুষের অবস্থা ভেদে দাওয়াতের স্তর বিন্যাস করে তা তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

১। যদি ব্যক্তি হক অন্বেষণকারী ও তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং হক পেলে সাথে সাথে তা অন্য যেকোন মতবাদের উপর প্রাধান্য দেয়, তাহলে তাকে শুধু হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া হবে। তার জন্য ওয়াজ নসিহত ও বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

২। আর যদি সে হকের বিপরীতে নিমগ্ন থাকে, কিন্তু হক চিনতে পারলে তা গ্রহণ করবে বলে আশা থাকে, তাহলে আশা ও ভয় দেখিয়ে নসিহত করতে হবে।

৩। অপরদিকে যে ব্যক্তি হকের বিরোধিতা করে এবং এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী তাকে উত্তম পন্থায় যুক্তি প্রমাণ পেশ করে দাওয়াত দিতে হবে। যদি ফিরে আসে তো ভালো। তা নাহলে সে ইসলাম বিরোধী বলে গণ্য হবে।

তাই দাঈ ইলাল্লাহ-এর দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহর দিকে আহ্বানের এ গুরুদায়িত্ব পালনকালে হিকমতের পথ অবলম্বন করা এবং দাওয়াত কর্ম হিকমত দিয়েই শুরু করা, এর প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া। যদি দাওয়াত প্রদত্ত ব্যক্তির মাঝে কোনো সংকীর্ণতা বা আপত্তি থাকে তাহলে উত্তম উপদেশের স্মরণাপন্ন হওয়া, উৎসাহ ব্যঞ্জক পবিত্র আয়াত ও হাদিসের উপদেশ দ্বারা দাওয়াত পেশ করা। যদি কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি সন্দিহান হয়, তাহলে উত্তম পন্থায় বিতর্কের রাস্তা গ্রহণ করা এবং কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌছার নিমিত্তে ধৈর্য্যধারণ করা। তাড়াহুড়ো বা বল প্রয়োগ কিংবা রূঢ় আচরণের চিন্তা পরিহার করা। বরং সন্দেহ নিরসনের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে প্রচেষ্টা চালিয়ে

চাওয়া। দলীলাদি উপস্থাপন করতে হবে উত্তম পদ্ধতিতে। হকের মাধ্যমে নিজে উপকৃত হওয়া, হক হক গ্রহণ করা এবং হকের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করা ও বিতর্ক আলোচনায় সন্তুষ্ট করে তাকে হক গ্রহণে উৎসাহী করার এটিই সহজ উপায়।

দাওয়াতের সঠিক পন্থা হলো, দাঈকে প্রজ্ঞাপূর্ণ, দূরদর্শী হয়ে দাওয়াত দানে প্রবৃত্ত হওয়া। তাড়াহুড়ো ও বল প্রয়োগের মানসিকতা ত্যাগ করে হিকমতের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া। কোর'আন ও হাদিসের প্রভাবপূর্ণ উপদেশ বাণীর মাধ্যমে দাওয়াত পেশ করা, যেগুলো দাওয়াত পেশকৃত ব্যক্তির হৃদয় মনে প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং হক গ্রহণে প্রেরণা দানে খুবই পারঙ্গম। বিতর্ক করার প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানেও উত্তম আদর্শের স্বাক্ষর রাখতে হবে, যুক্তিপূর্ন তথ্য ও নম্রতাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে নিজ মতাদর্শে বিশ্বাসী ও অনুপ্রাণিত করার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। সফল হতে হলে এ পদ্ধতির বিকল্প নেই।

নিম্নে রাসূল (ﷺ) এর দাওয়াতী কাজের একটা চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

রাসূল (ﷺ) এর দা'ওয়াতী কাজকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

(ক) ইসলামী দা'ওয়াতের প্রস্তুতি ও দা'ওয়াতের সূচনা,

(খ) গোপনে ইসলামের দা'ওয়াত,

(গ) প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত।

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(ক) ইসলামী দা'ওয়াতের প্রস্তুতি ও দা'ওয়াতের সূচনা :

নৈতিকতার প্রশিক্ষণ ও চারিত্র গঠন :

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন প্রথম থেকেই রাসূল (ﷺ) কে দা'ওয়াতের উপযোগী করে গড়ে তুলতে উত্তম চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। রাসূল (ﷺ) এ সম্পর্কে বলেন, أَدَّبَنِيْ رَبِّيْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِيْ "আল্লাহ আমাকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন।" (সা'বিল আদ-দা'ওয়াহ) আল-কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী বোঝা যায়, তিনি চরিত্রের সর্বোত্তম

স্থানে পৌঁছেছিলেন। আল্লাহ বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ "আপনি সর্বোচ্চ চরিত্রের অধিকারী।"(সূরা আল-কলম-৪) এভাবে আল্লাহ তাঁকে দৈহিক, মানুসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরী করেন। নবুওয়াতের পূর্বে মক্কার কোন অশ্লীল কাজে তিনি কোনদিন অংশগ্রহণ করেননি।

জ্ঞান অন্বেষণের নির্দেশ :

ওহী নাযিলের পূর্বে তিনি আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও আনুগত্য করার জন্য কঠোর চেষ্টা করতেন। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। তিনি যখন মায়া-মমতা, ভালবাসা, বীরত্ব, ধৈর্য, কষ্ট ও পরিশ্রমসহ সকল গুণের অধিকারী হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ তাঁর নিকট প্রথম ওহী নাযিল করে বললেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ "পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-আলাক-১-২) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ﷺ) কে পড়া ও জ্ঞান শিক্ষার প্রতি আহবান করেছেন। এ ওহীর কারণে তাঁর মনের জড়তা দূর হয় এবং এর মাধ্যমে তিনি মানসিক শক্তি অর্জন করেন।

রাত্রি জাগরণের নির্দেশ :

আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ﷺ) কে দা'ওয়াতী কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে রাত্রি জাগরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا "হে চাদর আবৃত! রাতে সালাতে দাঁড়াও কিছু অংশ ছাড়া। রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম। অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন আবৃত্তি কর। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি এক অতিভারী বাণী নাযিল করছি।" (সূরা মুজ্জাম্মিল- ১-৫)

এ আয়াতে রাতের কিছু অংশে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে ও কুরআন অধ্যয়ন করতে বলা হয়েছে। এটা এ জন্য যে, আপনাকে দা'ওয়াতের যে বিরাট কাজে নিয়োগ করা হয়েছে তার জন্য আল্লাহর সহযোগিতা কামনা করুন। আর এ রাত্রি জাগরণের ফলে আত্মা হবে পবিত্র, শক্তিশালী এবং আপনার শরীর হয়ে উঠবে পরিশ্রম উপযোগী।

আর আপনি আল্লাহর নিকট থেকে সব ধরণের পুরস্কার লাভ করতে পারবেন। (রসূল (ﷺ) এর দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম)

ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা :

রাসূল (ﷺ) পূর্ণ এক বছর রাতের পুরো অংশ অথবা আংশিক ইবাদাতে কাটাতে লাগলেন। এমনি এক সময়ে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ﷺ) এর উপর ওহী অবতীর্ণ করে বলেন,

(১)يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (২)قُمْ فَأَنْذِرْ (৩)وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (৪)وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (৫)وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ
(৬)وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (৭)وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

"হে বস্ত্রাবৃত! উঠ, অতঃপর সতর্ক কর। আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর। আর অপবিত্রতা বর্জন কর। আর অধিক পাওয়ার আশায় দান করো না। আর তোমার রবের জন্যই ধৈর্যধারণ কর।" (সূরা আল-মুদ্দাচ্ছির-১-৭)

উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে রাসূল (ﷺ) কে দা'ওয়াতী কাজ করার নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং সাথে সাথে ইসলামী সমাজ বিনির্মানের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করার কথাও বলে দেওয়া হলো। তাহলো (ক) মন ও হৃদয়কে পবিত্র করা, (খ) অপবিত্রতা বর্জন করা, (গ) প্রতিদান পাওয়ার আশায় কাউকে কিছু দান না করা, (ঙ) সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা, (চ) দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য না চাওয়া এবং এ কাজে সর্বোত্তম ধৈর্যের নীতি অবলম্বন করা। রাসূল (ﷺ) এই দাওয়াতী মিশন থেকে মুসলিম উম্মাহ ও দায়ী ইলাল্লাহদের জন্য শিক্ষা হচ্ছে, পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন উপরোক্ত পদ্ধতিতে ইসলামী দাওয়াতের কাজ করে যেতে হবে।

(খ) ইসলামী দা'ওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায় :

গোপনে ইসলামের দা'ওয়াত:

আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে রাসূল (ﷺ) ইসলামী দা'ওয়াতের কাজ শুরু করলেন। তিনি সর্ব প্রথম সবচেয়ে নিকট আত্মীয়দের কাছে দা'ওয়াত দেওয়ার টার্গেট নির্ধারণ করলেন। সে মোতাবেক প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) কে দা'ওয়াত দেন, তিনি এ দা'ওয়াত কবুল করে সর্ব প্রথম মুসলমান হলেন।

এরপর রাসূল (ﷺ) তাঁর নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে আলী (রাঃ) ও স্বীয় গোলাম যায়েদ বিন হারেছাকে দা'ওয়াত দেন। তখন আলীর বয়স ছিল দশ ও যায়েদের বয়স ছিল পনের বছর। এভাবে রাসূল (ﷺ) প্রথমে পরিবারের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করেন।

এরপর রাসূল (ﷺ) সিদ্ধান্ত নিলেন, জাহেলী সমাজে যারা চরিত্রবান এবং তাঁর সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু তাঁকে দা'ওয়াত দিবেন। আবু বকর (রাঃ) ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। তিনি তাঁকে দা'ওয়াত দিলেন। আবু বকর (রাঃ) দা'ওয়াত কবুল করলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি সত্যবাদী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল।'

আবু বকর (রাঃ) ইসলাম কবুল করার পর বললেন, আমার কাছে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান আছে যে ইসলামের এই দাওয়াত গ্রহণ করবে। রাসূল (ﷺ) বললেন, আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। আবু বকর (রাঃ) আরকাম ইবনে আরকামের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তাকে বলা হলো, "হে আরকাম ইবনে আরকাম বল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।" আরকাম ইবনে আরকাম জবাবে বললেন, اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهَ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ صَدَّقْتَ يَا مُحَمَّدْ بْنِ عَبْدُ أَللهِ "হে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (ﷺ) আপনি সত্য বলেছেন। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল।"

নবী করীম (ﷺ) বলেন, "আবু বকর ছিলেন তৎকালীন সমাজে একজন গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি।" ঈমান আনার পর তিনি সমাজের এমন কিছু ব্যক্তিবর্গকে

দা‘ওয়াতের জন্য বেছে নেন যাদের উপর তার দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। যখন তিনি তাদেরকে দা‘ওয়াত দেন তারা সকলে সে দা‘ওয়াত গ্রহণ করেন। (রসূল (ﷺ) এর দা‘ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম)

রাসূল (ﷺ) তিন বছর গোপনে দাওয়াতী কাজ করলেন। এভাবে গোপন দা‘ওয়াতে যারা ইসলাম কবুল করেন তাদের সংখ্যা ছিল ৬০ জন। যার মধ্যে ১২জন মহিলা এবং ১৪জন গোলাম ছিল। (তারিখ আদ-দা‘ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ)

(গ) ইসলামী দা‘ওয়াতের তৃতীয় পর্যায়:

প্রকাশ্যে ইসলামের দা‘ওয়াত:

গোপনে ৩ বছর দা‘ওয়াতে সর্বমোট ৬০জন ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে রাসূল (ﷺ) দিপ্ত কদমে দা‘ওয়াতী কাজ করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আল্লাহ তা‘আলা প্রকাশ্যে দা‘ওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ “সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের পরোয়া করো না।” (সূরা আল-হিজর-৯৪)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ “আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর। আর মু’মিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তুমি তোমার বাহুকে অবনত কর। তারপর যদি তারা তোমার অবাধ্য হয়, তাহলে বল, তোমরা যা কর, নিশ্চয় আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।” (সূরা আশ-শূ’আরা- ২১৪-২১৬)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (ﷺ) প্রকাশ্যে তাঁর দা‘ওয়াতী কাজ শুরু করেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এ সময় রাসূল (ﷺ) আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ভয় প্রদর্শনের জন্য। অতঃপর আমি তা থেকে চুপ থাকি। তারপর জিবরাঈল আসলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! তোমাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তুমি যদি তা পালন না কর তাহলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে। (দালায়েল ওয়ান-নবুওয়াহ)

আল-কুরআনেও এভাবে কঠিনভাষায় রাসূল (ﷺ) কে দাওয়াতী কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ

"আর যদি তাদের উপেক্ষা তোমার উপর কঠিন মনে হয়, তাহলে যদি তুমি পার যমীনে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আসমানে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে, অতঃপর তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আসতে (তবে কর)। যদি আল্লাহ চাইতেন তিনি অবশ্যই তাদেরকে হিদায়াতের উপর একত্র করতেন। সুতরাং তুমি কখনো মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরা আল-আনআম-৩৫)

রাসূল (ﷺ) প্রকাশ্যে দাওয়াতী কাজে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অপলম্বন করেনঃ

ভোজ সভার আয়োজন করে দা'ওয়াতী কাজ:

ইসলামের দা'ওয়াত প্রদানের জন্য রাসূল (ﷺ) হযরত আলী (রাঃ) কে ভোজ সভার আয়োজন করতে বললেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) এর কথা মত ভোজের আয়োজন করলাম এবং সকলকে একত্রিত করলাম। তারা ছিল মোট ৪০ জন। তাদের মধ্যে রাসূল (ﷺ) এর চাচা আবু তালিব, হামযা, আব্বাস, আবু লাহাব, ও অন্যান্যরা ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) খাবার পরিবেশন করলেন। তারপর রাসূল (ﷺ) বললেন, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর, আমি আপনাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের এমন কল্যাণ নিয়ে আগমন করেছি, যা আরবের কোন ব্যক্তি তার স্বজাতির জন্য কোনদিন আনয়ন করেনি। আমি আপনাদেরকে সে কল্যাণের দিকে আহবান জানাচ্ছি। সত্যের এ আহবানে কে সাথী হবেন আসুন। পথ প্রদর্শক তার সঙ্গীদের সাথে কখনো মিথ্যা বলে না। আল্লাহর শপথ, যদি সকল লোক মিথ্যা কথা বলে আমি আপনাদের নিকট মিথ্যা বলব না। যদি সকল লোক ধোঁকা দেয় আমি আপনাদের ধোঁকা দিব না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি বিশেষভাবে আপনাদের ও সকল মানুষের নিকট আল্লাহর রাসূল হিসেবে মনোনীত। আল্লাহর শপথ যেভাবে তোমরা নিদ্রা যাও সেভাবে মৃত্যুবরণ করবে। যেভাবে তোমরা নিদ্রা থেকে উঠ সেভাবে

কবর থেকে জাগ্রত হবে। তোমরা যে কাজই করো না কেন আল্লাহর কাছে তার হিসাব দিতে হবে। ভাল কাজের জন্য ভাল পুরস্কার মন্দ কাজের জন্য মন্দ পুরস্কার পাবে। মনে রেখ, বেহেশত চিরস্থায়ী দোযখও চিরস্থায়ী। আল্লাহর শপথ, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! আমি তোমাদের নিকট যে উত্তম জিনিস নিয়ে এসেছি, আমার জানা মতে জাতির মধ্যে কোন যুবক তা নিয়ে আসেনি। আমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিয়ে এসেছি। তাঁর কথা শুনে সকলে একটু নরম সুরে কথা বললো। কিন্তু আবু লাহাব বললো, চলো সে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। (আদ-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ ফি আহদে আল-মক্কী)

সাফা পাহাড়ে একত্রিত করে দা'ওয়াত প্রদান:

একদিন রাসূল (ﷺ) সকাল বেলা সাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাড়িয়ে উচ্চস্বরে বললেন, يَا صَبَاحَاهْ 'হে প্রভাত কালের বিপদ!' এ কথা বলে তিনি মক্কার প্রতিটি গোত্রের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। রাসূল (ﷺ) এর আওয়াজ শুনে সকল বংশের লোকেরা ঘর থেকে বের হয়ে আসল। যে নিজে আসতে পারে নাই সে খবরের জন্য অন্যকে পাঠালো। সকলে উপস্থিত হলে রাসূল (ﷺ) বললেন, أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ "আমি যদি বলি যে, এ পাহাড়ের অপর পাশে এক বিরাট শত্রুবাহিনী রয়েছে তারা তোমাদের উপর এখনই আক্রমন করবে। তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলে জবাব দিল, আমাদের জানা মতে তুমি কখনো মিথ্যা কথা বলনি। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, আল্লাহর আযাব আসার পূর্বে আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি. তোমরা সে আযাব থেকে বাঁচার চেষ্টা কর।" (সহীহ আল-বুখারী)

এ কথা শুনে রাসূল (ﷺ) এর চাচা আবু লাহাব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো, تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا "তোমার সর্বনাশ হোক, এ জন্যই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ?" এর পরই আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব অবতীর্ণ করে বলেন, تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ "ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ এবং যা সে অর্জন করেছে তা তার

কাজে আসবে না। অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে। আর তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহনকারী।" (সূরা লাহাব, আয়াত- ১-৪) আবু লাহাব শেষ পর্যন্ত মারাত্মক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে। (ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী)

চাচা আবু তালিবকে ইসলামের দা'ওয়াত প্রদান:

রাসূল (ﷺ) এর পর চাচা আবু তালিবকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। আবু তালিব যখন রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি কি দ্বীন পালন করছ? রাসূল (ﷺ) জবাব দিলেন, চাচা এটা আল্লাহর, তাঁর ফিরিশতার, তাঁর রাসূল ও ইবরাহীমের দ্বীন। আল্লাহ আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। হে চাচা, আপনি আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। সুতরাং আমি মনে করি, এ দ্বীন প্রথমে আপনাকে গ্রহণ করা উচিত। তখন আবু তালিব বললেন, হে ভাতিজা আমি কখনো বাপ-দাদাদের ধর্ম ত্যাগ করতে পারব না। তবে তোমাকে কেউ কষ্ট দিবে সেটা সহ্য করব না। (ইবনে হিশাম, সীরাতুন-নবুবীয়া) এভাবে রাসূল (ﷺ) শত বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে আল্লাহর দ্বীনের দা'ওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। তিনি রাত-দিন গোপনে-প্রকাশ্যে ইসলামী দা'ওয়াতের কাজে লিপ্ত থাকতেন।

(ঘ) মক্কার পাশ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের দা'ওয়াত:

হজ্জের মৌসুমে ইসলামের দা'ওয়াত:

মক্কার কা'বা ঘর বিশ্বের মানুষের কাছে যুগ যুগ ধরে অত্যন্ত সম্মানিত হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) এর অনুসারী হিসেবে পৃথিবীর সকল এলাকা থেকে মক্কার এ ঘর তাওয়াফ করতে আসত। ইসলামের আগমনের পূর্বেও এ ঘর ছিল ধর্মীয় ও সাহিত্য উৎসবের কেন্দ্রবৃন্দ। হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর যুগেও মক্কার উকায, মাজনা, জিমেযায উৎসবে যে কবিতার আসর বসতো সেখানে রাসূল (ﷺ) ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন। তিনি প্রত্যেক গোত্রের লোকদেরকে আহবান করে বলতেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا "হে মানুষ সকল বলো,

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।" (মুসনাদ আহমদ ইব্ন হাম্বল)

রাসূল (ﷺ) যখন বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বলতেন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ইবাদাত করতে বলেছেন এবং তাঁর সাথে কারো শরীক করতে নিষেধ করেছেন। তখন আবু লাহাব এসে বলতো, হে মানুষ এ ব্যক্তি তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মমত ত্যাগ করতে বলছে। (রসূল (ﷺ) এর দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম)

রাসূল (ﷺ) মিনা, আকাবাসহ মক্কার সকল স্থানে সমাগত লোকদের মাঝে গমন করে ইসলামের দা'ওয়াত প্রদান করেন। হজ্জের মওসুমে রাসূল (ﷺ) এর সাথে হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ) উপস্থিত থাকতেন। তারা রাসূল (ﷺ) এর দা'ওয়াতের সময় বিভিন্ন বংশের লোকদের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এ সময় মক্কার যুবকগণ সমাগত গোত্রের লোকদের নিকট গিয়ে বলতো, তোমরা এ লোকের কোন কথা গ্রহণ করবে না। সে আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা করছে। সে আসলে একজন গণক। তার কাজ আমাদের মধ্যে পিতা-পুত্রে বিরোধ ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা। (ইবনে হিশাম, সীরাতুন-নবুবীয়া)

তায়েফে ইসলামের দা'ওয়াত :

মক্কায় দা'ওয়াতী কাজে আশানুরূপ ফল না পেয়ে রাসূল (ﷺ) তায়েফ গমন করেন। সেখানে তিনি বনু সাকীফ গোত্রের নেতৃস্থানীয় তিন ভাইকে দা'ওয়াত দেন। তারা হলো, আব্দে ইয়ালীন, মাদউদ এবং হাবীব। তারা রাসূল (ﷺ) এর দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো এবং তায়েফের যুবক, গোলাম ও দুষ্ট লোকদেরকে মুহাম্মদ (ﷺ) এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলো। তারা নানা ভাষায় গালা-গালি করতে করতে তাঁর পিছু পিছু ছুটলো। রাস্তার দু'পাশ থেকে পাথর নিয়ে মারতে মারতে ক্ষত-বিক্ষত করলো। রাসূল (ﷺ) এর পবিত্র চরণযুগল থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। তিনি বসে পড়লে তাঁর দু'বাহু ধরে আবার উঠিয়ে দেয়া হত। শেষ পর্যন্ত রাসূল (ﷺ) তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে পথের

পাশে একটি খেজুর বাগানে আশ্রয় নেন। যে বাগানের মালিক ছিল উতবা ও সাইবা। তারা উভয়ে তখন বাগানে অবস্থান করছিল। রাসূল (ﷺ) এর এ অবস্থা দেখে তাদের ক্রীতদাস আদ্দাসকে ডেকে কিছু আঙ্গুর নিয়ে রাসূল (ﷺ) এর কাছে পাঠালেন। তিনি আঙ্গুর হাতে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে খেতে শুরু করেন। (ইবনে হিশাম, সীরাতুন-নবুবীয়া) আদ্দাস আশ্চার্য হয়ে বললো, খাওয়ার সময় এ দেশের মানুষ তো এ ধরণের বাক্য পড়ে না। রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি কোন দেশের লোক? তোমার দ্বীন কি? আদ্দাস বললো, আমি খৃষ্টান, নিনুনী দেশে আমার বাড়ী। রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি ইউনূচ পয়গম্বর এর দেশের মানুষ। আদ্দাস বললো, আপনি কিভাবে জানেন? রাসূল (ﷺ) বললেন, তিনিও নবী ছিলেন, আমিও নবী। আমরা ভাই ভাই। এ কথা শুনে আদ্দাস রাসূল (ﷺ) এর হস্তদয় চুম্বুন করতে লাগলেন এবং তিনি ইসলাম কবুল করলেন। (ইবনে হিশাম, সীরাতুন-নবুবীয়া) রাসূল (ﷺ) এর এ অবস্থা দেখে দু'জন ফিরিশ্তা এসে বললো, হে মুহাম্মদ! আপনার অনুমতি পেলে তায়েফের বড় দু'টি পাহাড় চাপা দিয়ে এদেরকে ধ্বংস করে দিবো। কিন্তু রাসূল (ﷺ) বললেন, না তারা বেঁচে থাকুক। হয়ত এমন এক সময় আসবে তাদেরই বংশ থেকে আল্লাহ এমন সন্তান জন্ম দিবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

(ঙ) বহির্বিশ্বে ইসলামের দা'ওয়াত:

হাবশায় হিজরতের মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত:

হযরত জাফর ইব্ন আবি তালিবের নেতৃত্বে হাবশায় হিজরতের ফলে ইসলামের সুমহান বাণী মক্কার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। হাবশা হিজরতের ফলে নাজ্জাশী হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিবের মুখে পবিত্র কুরআনের বাণী শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং তিনি রাসূল (ﷺ) এর সাহাবীদেরকে সাহায্য-সহযোগিতার ঘোষণা দেন এবং দা'ওয়াতী কাজে সহযোগিতা করেন। বাদশা নাজ্জাশী আল-কুরআনের বাণী শুনে বলেন, হে মুসলামানগণ! তোমাদের প্রতি ও তোমাদের নবীর প্রতি ধন্যবাদ। মুহাম্মদ একজন সত্যবাদী নবী সে কথা আমি ইঞ্জিলে পড়েছি। আল্লাহর শপথ যদি আমার উপর রাজ্য

শাসনের ভার অর্পিত না হতো তাহলে আমি শেষ নবীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর পাদুকায় মাথা রেখে জীবনকে ধন্য করতাম। নিজ হাতে পাত্র নিয়ে তাঁকে অযু করাতাম। তাঁর পদসেবায় একমাত্র মুক্তির পথ। (ড. আহমদ সালাভী, আর-রিক আল-মাওকিফুল ইসলাম ফিহি) বাদশা নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ ও মুসলমানদেরকে নিরাপদে বসবাস করার সুযোগ প্রদানের কারণে হযরত জা'ফর (রাঃ) হাবশাতে ইসলামী দা'ওয়াতের জন্য প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। (ড. আহম্মদ ফুয়াদ সাইয়েদ, তারিখ আদ-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়া আহদে রাসূল)

বাদশা নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ মদীনায় পৌঁছার পর সেখানকার আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় মক্কাতে এসে হজ্জের মৌসুমে রাসূল (ﷺ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। যা রাসূল (ﷺ) এর মদীনা হিজরতের পথ সুগম করে। হাবশায় ইসলামের আগমন ও নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দ্রুত সিরিয়াতেও পৌঁছে যায়। সেখানেও বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। (রসূল (ﷺ) এর দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম)

পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত:

বহিঃবিশ্বে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে রাসূল (ﷺ) এবার পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াত দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন। সর্বপ্রথম তিনি 'বাইজাইন্টাইন সম্রাজ্যের' শাসনকর্তা হিরাক্লিয়াস এর নিকট দাহিয়া কালবী (রাঃ) কে দিয়ে পত্র লিখে পাঠান। পত্রের ভাষা ছিল এরূপ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ وَ }يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে রোমের প্রধান হিরাক্লিয়াসের নিকটে হিদায়েতের অনুস্মরণকারীদের প্রতি সালাম।

অতঃপর আপনাকে ইসলামের দিকে আহবান করছি। ইসলাম গ্রহণ করে সর্ব প্রকার অকল্যাণ থেকে মুক্ত থাকুন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। (ঈসা (আ.) ও মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রতি ঈমান আনার কারণে), যদি আপনি এতে সম্মত হন তাহলে আপনার প্রজাদের পাপের জন্য আপনি দায়ী থাকবেন, কেননা সাধারণ জনগণ তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করে। হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্ল¬াহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্ল¬াহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।" (সহীহ আল-বুখারী)

পত্র পাওয়ার পর হিরাক্লিয়াস এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আরবের কোন লোককে দরবারে আনার জন্য বললেন। ঘটানাক্রমে এ সময় ইসলামের প্রধান শত্রু আবু সুফিয়ানকে পাওয়া গেল। তাকে সম্রাটের দরবারে ডেকে আনা হলো এবং কিছু প্রশ্ন করা হলো। সম্রাট আবুসুফিয়ানের নিকট থেকে সকল বিষয় অবগত হয়ে বললেন, হে আবু সুফিয়ান তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি সত্য সত্যই আল্লাহর নবী, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস আমার পদতলস্থ ভূভাগ শীঘ্রই তাঁর করতলগত হবে। একজন রাসূল আগমন করবেন এ সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম। কিন্তু তিনি যে আরবে অবির্ভূত হবেন, এ কথা আমি জানতাম না। আমার যদি সুযোগ হত তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতাম এবং তাঁর পবিত্র পদযুগল ধৌত করে নিজেকে ধন্য করতাম। (মুহাম্মদ গাজ্জালী, ফিকহুস-সীরা)

অতঃপর রাসূল (ﷺ) পারস্য সম্রাটের নিকট আবদুল্লাহ ইব্ন হুযায়ফার মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন এবং হুযায়ফাকে বললেন, তুমি বাহরায়নের শাসনকর্তা মুনযিরের হাতে পত্রখানা দিয়ে তাকে কিসরার নিকট পৌঁছে দিতে বলবে। পারস্য সম্রাট পত্র পড়ে বললো, আমার নিকট এভাবে কে পত্র লিখেছে? শুরুতে আল্লাহর নাম, তারপর প্রেরকের নাম, তারপর সম্রাটের নাম। এ কতবড়

অপমান! এ অপমান সহ্য করা যায় না। এ কথা বলে তিনি পত্রখানা ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে।

এরপর রাসূল (ﷺ) মিসরের রাজা মুকাওকিসের নিকট বিশিষ্ট সাহাবী হাতিব ইব্ন আবি বালতায়া এর মাধ্যমে দা'ওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। পত্র পাওয়ার পর মুকাওকিস প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণ না করলেও তিনি রাসূল (ﷺ) এর নবুওয়াত স্বীকার করে নেন এবং খুশি হয়ে মারিয়া ও সীরীন নামে দু'জন কুমারীকে হাদীয়া হিসেবে প্রেরণ করেন। এছাড়া বাদশা উপঢৌকনস্বরূপ পাঁচটি কিবতি পোশাক ও এক হাজার দীনার প্রেরণ করেন।

আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশী জা'ফর ইব্ন আবি তালিবের নিকট থেকে পূর্বেই ইসলামের দা'ওয়াত পান এবং রাসূল (ﷺ) এর নবুওয়াতকে মেনে নেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূল (ﷺ) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমর ইব্ন উমাইয়া আদ-দারীমী (রাঃ) কে বাদশা নাজ্জাশীর দরবারে দূত হিসেবে পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত নামা প্রেরণ করেন। নাজ্জাশী পত্রখানা পড়ে প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেন এবং আমর ইব্ন উমাইয়ার নিকট চিঠির উত্তর দেন।

এছাড়া হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) নাযরানবাসীদের নিকট, ইয়ামামার বাদশা এর নিকট, বাহরায়েনের সম্রাট এবং ওমানের সম্রাট এর নিকট দা'ওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, রাসূল (ﷺ) ছিলেন এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দা'য়ী ইলাল্লাহ। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত ব্যয় করেছেন ইসলামী দা'ওয়াতের প্রচার-প্রসার তথা ইসলামের সুমহান আদর্শ মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আমরাও একজন মুসলিম ও রাসূল (ﷺ) এর ওয়ারিশ হিসেবে ইসলামের সুমহান আদর্শের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার জন্য রাসূল (ﷺ) কর্তৃক প্রণীত উপরোক্ত পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে পারি তাহলে আমরাও দাওয়াতী কাজে ব্যাপক সফলাত পাব এবং

আখেরাতেও উত্তম প্রতিদান পাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমারেদ তৌফিক দান করুন। আমীন।

আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাওয়াতের রীতি-পদ্ধতি নাজিল করেছিলেন। কোরআনুল কারিমে ইসলাম গ্রহণের সে পদ্ধতিটি অবলম্বন করে তিনি রোমের সম্রাটকে দাওয়াত দিয়েছিলেন।

কোরআনের বৈচিত্রময় দাওয়াতের পদ্ধতি দেখে স্বয়ং রোমের সম্রাটও বিস্মিত হয়েছিলেন। ইসলামের দাওয়াত এত সুন্দর ও কল্যাণকর হতে পারে! দাওয়াতের ব্যাপারে উভয় পক্ষের জন্য সাধারণ একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মহান আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছিলেন এভাবে-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

(হে রাসূল! আপনি) বলুন, ‘হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস। যা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান। (তা এই যে,)-

- আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না,
- তাঁর সঙ্গে কোনো শরিক সাব্যস্ত করব না এবং
- একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না।

এরপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলুন, ‘তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা (মুসলিম) আত্ম-সমর্পণকারী।’ (সূরা আল-ইমরান : আয়াত ৬৪)

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মূলনীতি ছিল এমন যে, ‘না তারা কোনো মূর্তিকে, না ক্রুশকে, না আগুনকে এবং না অন্য কোন কিছুকে প্রভু বলে স্বীকার করবে। বরং কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত করব। আর এটাই ছিল প্রত্যেক নবীর দাওয়াত।

রোম সম্রাটের প্রতি বিশ্বনবীর চিঠি

কোরআনুল কারিমের এই নির্দেশ অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি পাঠান এবং চিঠির মাধ্যমে এই আয়াতের দাবী অনুযায়ী তাকে ইসলাম কবুল করার প্রতি আহবান জানান। দাওয়াতটি ছিল এমন-

فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، أَسلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ

অর্থাৎ ইসলাম কবুল করে নাও, নিরাপত্তা পাবে; মুসলিম হয়ে যাও, তাহলে মহান আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ নেকি দেবেন। কিন্তু যদি তুমি ইসলাম স্বীকার না কর, তাহলে তোমার কতৃত্বাধীন প্রজাদের পাপও তোমার উপর পতিত হবে। (বুখারি)

কারণ, প্রজাদের ইসলাম স্বীকার না করার কারণই হবে তুমি। কোরআনুল কারিমের আলোচ্য আয়াতে তিনটি মৌলিক বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। তাহলো-

১. কেবল আল্লাহরই ইবাদত করা;

২. তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা এবং

৩. কাউকে শরিয়তের বিধান প্রণয়নের ইলাহি মর্যাদা না দেওয়া।

এটাই সেই 'অভিন্ন বাক্য' যার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতি আহলে-কিতাবদেরকে আহবান জানানো হয়েছিল। (আহসানুর বয়ান)

সুতরাং বর্তমান সময়েও এই শতধা-বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করতে এ আয়াতে উল্লেখিত উক্ত তিনটি বিষয়কে এবং এই 'অভিন্ন বাক্য'কে অধিকরূপে মূলনীতি ও বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করার বিকল্প নেই।

তাফসিরে জালালাইনের বর্ণনায়-

হে রাসূল! আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব তথা আসমানি কিতাবের অনুসারি ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানরা, আস এমন কথার দিকে; যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই রকম। একই সমান তার বিষয়সমূহ। তাহলো- আমরা আল্লাহ ব্যতিত কারও ইবাদত করি না, কোনো কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরিক করি না। তোমরা যেমন তোমাদের ধর্মের

অভিজ্ঞ ও সন্ন্যাসীদেরকে ‘রব’ বলে মেনে নিয়েছ, তেমনি আমাদের কেউ আল্লাহ ব্যতিত অপর কাউকেও রব বলে গ্রহণ করে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া থেকে বিমুখ হয় তবে তোমরা তাদের বল- তোমরা আমাদের ব্যাপারে এ কথার উপর সাক্ষী থাকা যে, আমরা আত্মসমার্পনকারী অর্থাৎ তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের অবলম্বনকারী।

ভিন্ন ধর্মে দাওয়াতের মূলনীতি:

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে দাওয়াত ও তাবলিগের মূলনীতি, পদ্ধতি কেমন হবে তা ঘোষণা করা হয়েছে। তাহলো- ‘আস! ওই বিষয়ের দিকে, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান’। এ আয়াত থেকে তাবলিগ ও ধর্মের প্রতি কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলকে আহ্বান করার মূলনীতি জানা যায়। তাহলো এমন যে-

‘ভিন্ন মতের কাউকে ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাতে হলে প্রথমে তাকে শুধু এমন বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানানো উচিত, যে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারেন।’

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে কুরআনুল কারিমের নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের দিকে আহ্বান করার তাওফিক দান করুন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো পদ্ধতিতে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে সম্পৃক্ত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

১১. শেষকথা:

আমাদের কাছে যতো নেয়ামত আছে তার মাঝে সবচেয়ে বড় ও মূল্যবান নেয়ামত হলো- ঈমানের নেয়ামত। ঈমানেরর এতো দাম যে, মৃত্যুর পর ঈমানের বিনিময়ে যদি দুনিয়ার মূল্যবান সবকিছু বিনিময় হিসেবে দেওয়া হয়- তবুও ঈমানের বিনিময় হতে পারবে না। ঈমানের এতো দাম যে, যদি ঈমানের মতো সম্পদ কারো না থাকে; তাহলে তার সবকিছু মূল্যহীন। মহান আল্লাহ তা’আলার কাছে সবচেয়ে বেশি দাম ঈমানের। শেষ নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যদি আল্লাহর

নিকট বিন্দুমাত্র দুনিয়ার কোনো দাম থাকতো; তবে কোনো কাফেরকে একবেলা খাওয়াতেন না। আল্লাহর কাছে দুনিয়ার দাম একটি মশার পাখার সমানও নয়। যদি একটি মশার পাখার সমানও দুনিয়ার দাম হতো- তবে একজন কাফেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে রাখতেন না।

সাহাবারা ঈমান শিক্ষা করাকে স্বতন্ত্র আমল জ্ঞান করতেন। আজ সামগ্রিক ঈমানের আলোচনা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। তাই আমাদের ঈমানের এতো দৈন্যতা। ঈমান শিখতে হবে সাহাবাদের নিয়মে। হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরাম যে পদ্ধতিতে দাওয়াতের কাজ করেছেন, আমাদেরও সেই পদ্ধতিতে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই মস্তবড় এক ভ্রান্তিতে রয়েছি।

আমরা মনে করি, আধুনিক যে কোনো মাধ্যমে বা যন্ত্র কিংবা মেশিনের সাহায্যে দ্বীনের দাওয়াত দিলে তা আদায় হবে। কিন্তু না এতে দাওয়াতের পরিপূর্ণ হক আদায় হবে না। একমাত্র নবীওয়ালা ও সাহাবিওয়ালা তরিকায় দাওয়াতের মাধ্যমেই এ কাজে পরিপূর্ণতা আসবে। কেননা তারাই আমাদের আদর্শ। তাদের বাতলানো পথই অনুকরণীয়।

একজন প্রকৃত মুমিনের জীবনাদ্দেশ্য হবে দাওয়াতী কাজের জন্য নিজেকে তৈরী করে ব্যক্তিজীবনে তার অনুসারী হয়ে পারিবারিক,সামাজিক,রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সর্বস্তরে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানকে পৌছে দেওয়া ও তাকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা।

এই দায়িত্ব পালনে কেউ অনিহা দেখালে অথবা অস্বীকার করলে দুনিয়া ও আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তমসাচ্ছন্ন এই সমাজ অজ্ঞতা, হীনতা, হিংসা-বিদ্বেষ, খুন-খারাবী, নগ্নতা ও বেহায়াপনার মত জঘন্য পাপাচারে নিমজ্জিত। সমাজের এহেন পরিস্থিতি মোকাবিলায় আল্লাহর পথে দাওয়াত দানের কোন বিকল্প নেই। দাওয়াতের মাধ্যমেই একটি সুষ্ঠু-সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গঠন করা সম্ভব। এ কাজে সবাইকে এগিয়ে আসা এখন সময়ের অনিবার্য দাবী। পরিশেষে উদাত্ত আহ্বান হল, সাহাবায়ে

কেরাম (রাঃ) থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত আকাবিরগণ যেমনিভাবে দাওয়াতের এই ফরজ দায়িত্বকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করে গিয়েছেন আমাদেরকেও আমাদের জামানার আল্লাহ ভোলা লোকদেরকে আল্লাহর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যেতে হবে।

দাওয়াতের এই ধারাবাহিকতা বাকি বা জারী থাকলেই আমাদের উত্তরসূরীরা ইসলাম পাবে ও তার ওপর আমল করে চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাত অর্জন করতে পারবে। আর এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। অন্যথায় দুনিয়াতে আল্লাহ বলার মত লোক না থাকলে দুনিয়াও বাকি থাকবেনা বরং আল্লাহ ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝা ও মানার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সাধ্যমত দ্বীনের দাওয়াতে সময় ও শ্রম কুরবানী করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111372102/